ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আমাদের আশ্রমের ইতিহাস বাহিরের ঘটনার দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ এখানে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা ভিতরের দিক্ হইতে ঘটিয়াছে। আমরা ইহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য একাদশ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ-কালে যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, আজ ঠিক্ সেইরূপ বুঝিতেছি না,—এবং আজ যাহা বুঝিতেছি তাহা যে সম্পূর্ণ বোঝা তাহা কে বলিতে পারে! এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া একটি কথা স্পষ্ট হইয়াছে মাত্র, সে কথাটি এই, যে বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে সত্যকে জানা এক জিনিস, আর কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া জানা আর এক জিনিস। তেমন করিয়া জানা কোন কালেই নিঃশেষিত হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে বহুকালাবধি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত আছি বলিয়া ইহাকে দূরে স্থাপন করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্লিপ্তভাবে দেখিতে হয়ত আমি অক্ষম; কিন্তু তেমন করিয়া যদি না দেখি তবে ইহার সত্যকে দেখিতে পাইব না। কর্ম্মের প্রবাহে উপচীয়মান নানা সংস্কারের দ্বারা ইহাকে এমন ক্ষুদ্র, এমন

ঘোরো করিয়া দেখিব যে, ইহা যে বিশ্বের জিনিস সেই কথাটা চাপা পড়িয়া যাইবে। মনে হইবে যে ইহাকে যেন আমরা এই কয়টি লোকে মিলিয়াই গড়িয়া তুলিতেছি। আমরা কি নিয়ম করিলাম আর কি উল্টাইলাম তাহাই যেন ইহার মধ্যে একমাত্র দেখিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। আধুনিক ভারতবর্ষে যে ইতিহাস আমাদের চিত্তসমুদ্রে, ভিতর হইতে, বাহির হইতে, নানা বিচিত্র শক্তির একত্র প্রভাবে মন্থন করিতেছে, যে মন্থনে ক্রমাগতই নব নব উদ্যোগ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যাহার আর বিরাম নাই— সেই ইতিহাসেরই গূঢ় গভীর অভিপ্রায় এই বিদ্যালয়ের জন্মদাতা; ইহার মধ্য দিয়া সে আপনাকে সুসিদ্ধ করিবার উপায় খুঁজিতেছে, এই কথাটি নিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে। নহিলে ইহাকে আমাদের পাঁচ জনের বিদ্যালয় বলিয়া এমন মায়ার সৃষ্টি করিব, যাহা হাস্যকর। আমরা! আমরা কি সৃজন করিব! সৃজনের লীলা যাঁর, আমরা তাঁহার মালমসলা; তিনি আমাদের জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌কে কোথায় কি ভাবে সাজাইয়া তাঁহার বিপুল প্ল্যানকে ক্রমে ক্রমে, ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়া তুলিতে থাকিবেন, সে তিনিই জানেন! আজ যে উদ্যোগ এখানে দেখিতেছি, তাহার সূচনাও কোন্ অতীতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও যেমন আমরা জানি না, তাহার পরিণামও যে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত তাহাও আমাদের কাছে তেমনি অপরিজ্ঞাত!

যেমন ধর, আমরা জানি যে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসরের উপর এই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন বিদ্যালয় ছিল না তাহা সত্য—অথচ তাই বলিয়া এ কথা কি করিয়া বলি যে ইহার আরম্ভ সবেমাত্র একাদশ বৎসর পূর্ব্বে! শান্তি-নিকেতনের সঙ্গে কি এই বিদ্যালয়ের যোগ নাই? খুবই আছে, শান্তিনিকেতন ইহার জননী, বিদ্যালয় তাহার সন্তান—শান্তিনিকেতনের গর্ব্ভেই বিদ্যালয় আপনার শরীর পাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্মের পূর্ব্বের সেই গর্ব্ভের ইতিহাসকে একেবারে অগ্রাহ্য করা তো চলে না। এম্‌নি করিয়া দেখা যায় যে আমরা যেখানে ইহার আরম্ভ কল্পনা করি, সেখানে ইহার আরম্ভ হয় নাই, সে একটা মাঝখানের পর্ব্ব। ঠিক্ তেমনি যদি এখন যে টুকু হইয়া উঠিয়াছে, তাহারি ক্ষীণ মাপকাঠির সাহায্যে ইহার ভবিষ্যৎকে পরিমাপ করিতে যাই, কবে সেই রকমই মিথ্যা হইবে। হয়ত বা এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে যে ইহা একটি এন্‌ট্রান্স স্কুলের উত্তম সংস্করণ, কিম্বা ভাল একটি বোর্ডিংস্কুল। ছেলে পড়াইবার এমন সুবিধা অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, যে ইহা যে আমাদের পাঁচ জনের একটা কীর্ত্তি, এই মিথ্যা কথাটা আজ ভুলিতে হইবে,—এ কথা নিঃসন্দেহে জানিতে হইবে যে ইহার উদ্দেশ্যকে আমাদের কীর্ত্তি এবং রচনাই অনেক জায়গায় আবৃত করিয়াছে, খর্ব্ব করিয়াছে এবং করিতেছে, আমরা এখানে সম্পূর্ণরূপে আপ-

নাদের ভুলিতে পারি নাই, মহৎ উদ্দেশ্যের পায়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগাকে জলাঞ্জলি দিয়া ইহার প্রকাশকে বাধাহীন ও দীপ্যমান করিতে অসমর্থ হইয়াছি।

আজ তাই, আপনাদের কাছে কীর্ত্তির গৌরব লইয়া আসি নাই, বরং খুবই কুণ্ঠা এবং বেদনা লইয়া আসিয়াছি। আত্মোৎসর্গ পরিপূর্ণ হয় নাই জানি। "হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি?" তবু যখন মহৎ উদ্দেশ্য এই অযোগ্যদের দ্বারাই আপনাকে আপনি সফল করিবেন, তখন সেই আশায় নিজের সমস্ত ত্রুটি-অপরাধ ভুলিয়া ভাঙাচোরাকে কেবলি জোড়া দিবার চেষ্টায় লাগিয়া যাই—ভাঙা তো তাঁর দিক্‌কার নয় সে আমার দিক্‌কার—হয়ত, আবার কোথায় ছিদ্র দেখা দিবে, তথাপি আশা ছাড়ি না—মেরামত করিয়া করিয়া চলি।

বাস্তবিক আশ্রমের ইতিহাসে আমরা এই কথারই প্রমাণ পাইব। আমরা ভাঙ্গিতেছি এবং মেরামত করিতেছি। এই একাদশ বৎসরেই কতবার সূত্র ছিঁড়িল—আবার ছিন্ন সূত্র কুড়াইয়া নূতন করিয়া মালা গাঁথিতে কতবার বসিলাম। আমাদের প্রত্যেকের অভাব অসম্পূর্ণতা সেই এক একটি ছিদ্র, আমাদের প্রত্যেকের ভাব এবং যথার্থ সম্পদ্ সেই ছিদ্র পূরণে ব্যস্ত। এই একরকমে একটা সৃষ্টির কাজ এখানে চলিতেছে। আর এক রকমে আর একটা কাজ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, যেখানে ভাঙাগড়ার ব্যাপার নাই, যেখানে একেবারে অখণ্ড সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টি কেমন, না

প্রবাল-দ্বীপের মত—টুক্‌রার সঙ্গে সঙ্গে টুক্‌রা মিলিয়া ক্রমে একটা ছোট দ্বীপ জাগিতেছে, আর ভিতর হইতে যে সৃষ্টি চলিয়াছে, সে কেমন, না একেবারেই এক উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের মধ্য হইতে মহাদেশের আবির্ভাবের মত। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই এই দুই দিক্ দিয়া সৃষ্টি-ব্যাপার চলে। কতকটা গড়ে মানুষ আপনার বিচিত্র প্রয়োজন অনুসারে, কতকটা গড়েন বিধাতা আপনার অমোঘ অভিপ্রায় অনুসারে। প্রতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের গড়া এবং সেই বিধাতৃপুরুষের আকস্মিক গড়া এ দুই যেখানে সম্মিলিত না হয়, সেখানে মহৎ ঘটনা কখনই সম্ভব হয় না। এই উভয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের দেখিতে হইবে আমাদের প্রতিষ্ঠান কি হইয়া উঠিতেছে।

এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিলেন। তিনি ব্যাকুল ভাবে ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জন্য বেদনায় মধ্যাহ্নের রবি-রশ্মি তাঁহার কাছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত, তিনি সত্যের জন্য বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্ব হইয়াও দুঃখ বোধ করেন নাই. তাঁহার এই সাধনা ব্রাহ্মসমাজকে এদেশে জন্ম দিল। অথচ মহর্ষির ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই দেখিতে পাই, যে তিনি এক দিনও মনে করেন নাই যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রতিষ্ঠায় বিধাতার হস্তই দেখিতে পাইতেন, নিজের হস্ত নহে। "আমার এই রচনার দ্বারাই সত্য প্রকাশ পাইতেছেন" সত্যকে তিনি এত ক্ষুদ্র এত পরিমিত করিয়া জানিতেনই না। তিনি জানিতেন

যে সত্য আপনার ভার আপনি গ্রহণ করে, কাহাকেও তাঁহার ভার লইতে হয় না। সেই জন্য তিনি কি করিয়াছেন বা করিতে পারেন সেইদিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিলনা, তিনি কেবলি পরিপূর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তো ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা—কিন্তু কোথায় তাঁহার দলবল? তাঁহার চেলাবর্গ কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেতো ধর্ম্ম-সভা—সেতো সম্প্রদায় নহে। যখনি সম্প্রদায়ের গোলযোগ উঠিল, মতামতের বাদবিসম্বাদ জাগিল, তখনি তাঁহার যে টুকু কাজ তাহা ভাঙ্গিল, কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য কি কিছুমাত্র টুটিয়াছিল? তিনি একলা পড়িতেও ভীত হইলেন না। ইহার কারণ তাঁহার দৃষ্টি কোন উপস্থিত কর্ম্ম সাধনের দিকেই নিবদ্ধ ছিলনা, কোন বিশেষ একটা উদ্দেশ্য, হোক্ তাহা সমাজসংস্কার বা অন্য কিছু—তাহাকেই সার্থক করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া মরাকে তিনি ধর্ম্মসাধনা বলিয়া জানিতেন না, তাঁহার মন্ত্র ছিল ঈশাবাস্যং—জীবনকে ভিতর হইতে শোধন করিয়া একেবারে অখণ্ড সত্যের দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলা। সেই জন্য ক্ষতি, দুর্যোগ, আঘাত, এই সকল সাময়িক ব্যাপারে তিনি বিচলিত হইতেন না—তিনি চাহিয়াছিলেন এমন লাভ—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিক্যং ততঃ—যাহা পাইলে আর কোন লাভকেই তদপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার কৃতকর্ম্ম ভাঙিল, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক শান্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এমন করিয়া নিজের সৃষ্টিকে নিজের চক্ষে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিলে অতি বড় মানুষেরও চিত্ত ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তিনি

সে সম্বন্ধে এমন নীরব হইলেন, যে আত্মজীবনীখানিও শেষ করিলেন না।

মহর্ষি সম্বন্ধে আমি এত কথার আলোচনা কি কারণে করিতেছি তাহা বলা আবশ্যক। এই শান্তিনিকেতন তো তাঁহার আশ্রম। সুরুলের রায়পুরের সিংহপরিবারের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা ছিল, একদিন বোলপুর হইতে সেই তাঁহাদের ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাইবার কালে পথে কিয়ৎকালের জন্য তিনি এই তৃণশূন্য প্রান্তরে ঐ সপ্তপর্ণ দ্রুমতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কি অনুভব করিলেন জানিনা, কিন্তু এই স্থানটি তাঁহার সাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। এখানে তাহার পরে তাঁবু ফেলিয়া তিনি বাস করিতেন। এখানে তিনি তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তিকে" পাইলেন। এই মরুভূমিতে অন্য স্থান হইতে মাটী আনাইয়া বাগান করিলেন, বাড়ী উঠিল, কাচের মন্দির নির্ম্মিত হইল, ট্রষ্টডীড্ করিয়া ইহাকে সকলের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া গেলেন। যাঁহারা তপস্যা করিবেন তাঁহাদের এই স্থান। নিষেধ রহিল শুধু মদ্য-মাংসাহার, কুৎসিত ও অশ্লীল আমোদ প্রমোদ ও প্রতিমা পূজা।

সে আজ চল্লিশ বৎসরেরও বেশি দিনের কথা। তাহার পর একদিন পর্য্যন্ত এ স্থান তো শূন্য পড়িয়া ছিল। মন্দিরে বেতনভুক্ পূজারী নিয়মিত শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া যাইত মাত্র। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যখন গেল, তখন তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র এই আশ্রমকেই কেন তিনি একটা কিছু

জাঁকালো কাণ্ড করিয়া গেলেন না! তিনি বেশ জানিতেন যে এ আশ্রমে কিছুই হইতেছে না। তবু একজন পূজারী এখানে সুর ধরিয়া থাকে এই আকাঙ্ক্ষাটুকু করার কি সার্থকতা ছিল? এ সম্বন্ধে অনেকে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, শান্তিনিকেতনের জন্য তোমাদের কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন, সেখানকার কাজ কিছুই হইল না দেখিয়া মরিলেও জানিব, কাজ হইবেই। তিনি সত্যকে নিজের চেয়ে অনেক বড় বলিয়া জানিয়াছিলেন বলিয়াই সত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধৈর্য্য ছিল। তাঁহার সাধনা সত্যের হাতে আপনাকে বিসর্জ্জনের সাধনা—হইবার সাধনা, করিবার নয়। "কাজ হইবেই"। কারণ কাজ যে বিধাতা স্বয়ং করিবেন।

যিনি আমাদের এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার এই সাধনাই আমাদেরও মর্ম্মগত সাধনা। আমরা যেন তাঁহার মত মনে করিতে পারি, যে বিধাতা গড়িতেছেন, আমরা নয়। মহর্ষি চিরজীবন কর্ম্ম করিয়াছিলেন অথচ কর্ম্মবন্ধনে ধরা দেন্ নাই, আমরাও কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষয় করিবার সাধনাতেই লাগিয়াছি, কেবল কর্ম্মজালে জড়াইয়া নিজেদের প্রচার করিবার জন্য এখানে আসি নাই। "কাজ হইবেই"। আজ যদি ভাঙে, কাল গড়িবে—একশত বৎসর যদি বা সে চুপ করিয়া থাকে, তাহার পরেও তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইবেই। যাহা হইবার তাহা হইবেই, তুমি শুধু আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া যাও। কারণ সেই পরিপূর্ণতাই বৃহৎ কর্ম্মকে ফলবান্ করিবার উপায়। মাটী যদি সরস না হয়, তবে শস্য হইবে কিসের উপর?

তুমি অমৃতধারায় জীবন-ভূমি পূর্ণ কর, এই তোমার কাজ— তাহা হইলেই সেই অন্যান্য কাজ হইবেই। "কাজ হইবেই"।

আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিবে না। আমরা এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিনা। কিন্তু মহর্ষির জীবন এই বাণীর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তিনি কর্ম্ম করিয়া অকৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই অকৃতার্থ-তাকেই তিনি সার্থক করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি ফল পাওয়ার যে Progress তাহা তিনি কোথাও কামনা করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ফলাকাঙ্খা হইতে বিরতির ইংরাজী নাম ccnservatism হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জীবনে আমরা দেখি যে তিনি যে ফল পান নাই ইহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। "তোমরা চিন্তা করিয়োনা, কাজ হইবেই"। তিনি জানিতেন যে আমাদের কাজ ঐ একবার ভাঙা, একবার মেরামত করা" ঐ প্রবাল-দ্বীপ গড়া বড় জোর,—আর বিধাতার কাজ এক উচ্ছ্বাসে মহাদেশ গঠন। কারণ তাঁর সৃষ্টিই অখণ্ড সৃষ্টি! বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলো-চনার পদে পদে তাই এই দুই রকমের সৃষ্টির লীলা আমরা দেখিতে পাইব তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনের সংকল্প করিলেন, তখন মহর্ষি তাঁহাকে এই কার্য্যে খুবই উৎসাহ দিলেন। আমি কবির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার মনে হঠাৎ এরূপ সংকল্পের উদয় হইল কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহার কাব্য-

জীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার একটা পরিবর্ত্তন ঘটতেছিল,—পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে গূঢ়নিবিষ্ট কেবলমাত্র ভাবময় জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছিলনা ;—আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড় ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল। কাব্যের পথ দিয়াই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে; ধর্ম্মনীতিতে প্রবেশ করিলেন ; সর্ব্বত্রই দেখিলেন আপনাকে ক্রমাগত খর্ব্ব করিয়া পূর্ণরূপে ত্যাগের আদর্শই কেবলি প্রকাশ পাইয়াছে। এই ত্যাগ ভোগের বিপরীত নহে, কিন্তু ভোগেরই পরিপূর্ণতর রূপ ; যেমন পরিপূর্ণ মঙ্গল হচ্ছেন শিব, কারণ তাঁহার সবই অমঙ্গলের ব্যাপার, পরিপূর্ণ সুন্দর হচ্ছেন কৃষ্ণ, কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্য বাহ্য কোথাও নাই। তার মানে আর কিছুই নয়, ভারতবর্ষ অমঙ্গলের অন্তরের মধ্যে শিবকে দেখিয়াছিল, বিরূপতা ও রূপের অভাবের মধ্যে অপরূপকে কামনা করিয়াছিল, ভারতবর্ষ সৌন্দর্য্যকে মঙ্গলের প্রেমকে ভূমার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়াছে। হরি এবং হর এই উভয়ের সম্মিলনেই আত্মার সম্পূর্ণতা তেমন করিয়া দেখিলে সমস্তই একাকার হইয়া মিলিয়া যায়, কোনটাই একান্ত হইয়া জীবনকে পুরাপূরি অধিকার করিয়া বসিতে পায় না। কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে,রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে—এই ভাবের পরিচয় পাইয়া কবি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কালিদাসের মত তাঁহার মাথাতেও তপোবনের কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমের আদর্শের মত জীবনযাত্রার

এমন পূর্ণাদর্শ আর হইতেই পারে না। এ আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্ম্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়—বাল্যে গুরুগৃহ-বাস ও ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা—সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা, সমস্ত জিনিসকে সেই বড় দিক হইতে আনন্দের দিক হইতে দেখিতে শিক্ষা করা—যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্দ্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসার-বন্ধনকে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান, তাহার পর মৃত্যুর সময় একাকী পরলোকে প্রয়াণ—শিক্ষাকে, সংসারকে, বিষয়-ভোগকে এমন মুক্তির সোপান করিয়া তোলার মত আদর্শ আর কোথায়? সুতরাং ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বানপ্রস্থ জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ়বয়সে কবিকে পাইয়া বসিল। আদর্শ কেবল কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে তিনি উৎসুক হইলেন।

ভারতবর্ষের এই আদর্শ তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি ইহারি ঝোঁকে ভারতবর্ষের সমস্তই আশ্চর্য্য ও রমণীয় করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকেই তখন প্রবল প্রতিক্রিয়ার স্রোত বহিতেছিল। তাহার কারণ কতকটা রাজনৈতিক ছিল—তাহা ভিক্ষুকের নৈরাশ্য—কিন্তু আসল কারণটা ছিল স্বাভাবিক—আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। পশ্চি-মেই যে সব আছে, সে যে সর্ব্ববিষয়েই আমাদের গুরু ও প্রভু—একথাটা সবলে অস্বীকার করিবার ও ইহার উল্টা

কথাটা বলিবার একটা জেদ্ তখন শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ পাইতেছিল। সেটা "স্বদেশী"র পূর্ব্বরাগ। আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের চাইই, কিন্তু তাহার ভিত্তিটা যে কোথায় তাহা খুঁজিবার জন্য প্রাচীন কালের মধ্যে ডুব দিবার একটা উদ্যোগ-পর্ব্ব চলিতেছিল। আমাদের সবই ছিল এবং পশ্চিমের চেয়ে অনেকাংশে ভালই ছিল,—এই জয়ঘোষণার উৎসাহ।

ইয়োরোপে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ নাই, সমাজের মধ্যে নানাভাবে যে সকল চেষ্টা ও চিন্তা জাগিতেছে বিদ্যালয়ে তাহাই স্থান পাইয়া বিদ্যালয় শিক্ষার্থীগণকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিতেছে। ইহা দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে আমাদেরও ভিতর হইতে একটা বিদ্যালয় ঠিক তেমনি করিয়া জাগে। সে আধুনিক বিদ্যালয়ের ন্যায় বাহিরের পুঁথি পড়াইবার ও পরীক্ষা পাশ করাইবার একটা যন্ত্রমাত্র না হৌক,—সে আমাদের দেশের ভাবে রসে চিন্তায় কল্পনায় উদ্বোধিত করিয়া অনুকরণ বৃত্তি হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া আমাদের সমাজকে একটি বিশেষ শক্তি দিক্! বাস্তবিক, এই ইচ্ছাই আমাদের এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার ভিতরকার ইচ্ছা ছিল। কেবল কলের শিক্ষা নয়, বিশ্বপ্রকৃতির রমনীয় বেষ্টনের মধ্যে গুরুগৃহে ভারতবর্ষের এখনকার সন্তানেরা মানুষ হইবে, তাহারা ভারতবর্ষকে জানিবে, প্রীতি করিবে, তাহারা উত্তরকালে গৃহস্থ হইয়া গৃহীর বিশুদ্ধ মঙ্গল আদর্শ রক্ষা করিবে, সমাজে নব নব মঙ্গলযজ্ঞ তাহারা সম্পন্ন করিয়া আমাদের দাসত্ব অর্থাৎ অন্তরের হীনতার পাশকে একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিবে—

আশ্রমের আরম্ভে আমি যতদূর বুঝি এই ভাবটিই প্রবল ছিল। 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকায় কবি তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার তপোবন কল্পনার যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার এই সময়ের ভাব ও কল্পনা বেশ বুঝা যাইবে।

এই স্বাদেশিকতার উত্তেজনায় যাঁহারা তখন ভরপুর, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ৺ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁহার আসল নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কেশব বাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে খুবই যোগ দিয়াছিলেন, তারপর তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল, তিনি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আমার বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের প্রভাবে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সাধনার দিকে খুব ঝোঁক দিয়া আমাদের দেশের রূপের সাধনার মাহাত্ম্য যখন একদল শিক্ষিত লোক কীর্ত্তন করিতেছিলেন,—ভক্তি সাধনার পক্ষে ভাবের বিগ্রহ যে প্রয়োজনীয় এই কথা প্রচার করিতেছিলেন—তখন উপাধ্যায় মহাশয়েরও মতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তিনি পৌত্তলিক না হইয়া রোমান্ ক্যাথলিক হইয়া বসিলেন।

অথচ বেদান্তশাস্ত্রে এবং মোটামুটি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে উপ্যাধ্যায় মহাশয়ের অধিকার ছিল। রোমান্ ক্যাথলিক্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার চিত্ত গভীর ভাবে হিন্দুই থাকিয়া গেল। তবে কেন যে তিনি রোমান্ ক্যাথলিক্ হইয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। আমার মনে হয় যে, আদর্শ-মনুষ্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা যে কারণে বঙ্কিমকে কৃষ্ণচরিত্র লিখাইয়াছিল, সেই

কারণে উপাধ্যায় হয়ত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। "তিনি খৃষ্ট ও মেরীর পূজা করিতেন। অথচ বেদান্ত ধর্ম্মের এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরও একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যে কিরূপ প্রবল স্বদেশাভিমানী ছিলেন তাহা ১ম বৎসরের বঙ্গদর্শনে, হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি প্রবন্ধপাঠ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের কোন আভাস মাত্রই ছিলনা।

বিদ্যালয় আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় মহাশয়ই ছাত্র ও অধ্যাপক জুটাইয়া আনিলেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইত না। অধিক বয়সের ছাত্র লওয়া হইবে না, এই নিয়ম গোড়া হইতেই প্রবর্ত্তিত হইল। ছাত্ররা নগ্নপদ হইল, উপানৎ এবং ছত্র ধারণ দুইই তাহারা বর্জ্জন করিল। প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় তাহাদিগকে চেলি পরিয়া উপাসনায় বসিতে হইত, তাহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য দেওয়া হইত। রন্ধন ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কাজ তাহাদিগকে নিজের হাতে করিতে হইত, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বাঁধে তাহারা স্নানার্থ গমন করিত, তার পর শুচিস্নাত হইয়া উপাসনান্তে এখনকার ল্যাবরেটরি গৃহে বা মুক্ত প্রাঙ্গণে বেদগান করিত, সকল ছাত্র ও অধ্যাপক সেই সময়ে মিলিত হইতেন। উপাসনান্তে ছাত্ররা অধ্যাপক-গণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতলে গিয়া উপ-বেশন করিত। ইংরাজী বাংলা অঙ্ক সংস্কৃত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরাজী সোপান এবং

সংস্কৃত প্রবেশের সেই সময়েই সূত্রপাত। কবি নিজে মুখে মুখে কথাবার্ত্তা কহিয়া ইংরাজী শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বাক্য রচনা করিতে বালকেরা শিক্ষা করিত—এইরূপে ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যাকরণ স্বতন্ত্র করিয়া না পড়িয়া মাতৃ-ভাষা শিক্ষার ন্যায় ইংরাজী ও সংস্কৃত দুইই তাহারা শিখিত। বিজ্ঞানও প্রথমাবস্থায় তিনি নিজে অধ্যাপনা করিতেন, তার পর আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত জগদানন্দ বাবু আসিবার পর হইতে তিনিই ছাত্রদের বিজ্ঞান-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তপোবন বসিল। পড়াশুনা, আরাম ও সুখ-ভোগকে খর্ব্ব করিয়া সরল জীবনযাত্রা, গুরুসেবা ও অতিথি-সেবা, এই সমস্ত পূর্ব্বকালের আশ্রমভাবে ছেলেরা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক তখন বালক মাত্র, কিন্তু বেশ মনে আছে একদিন বয়স্ক দেশমান্য পণ্ডিত-সভায় রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ শুনিয়া কিরূপ অসহিষ্ণু হইতে হইয়াছিল। "ইউটোপিয়া" কথাটা আপনাদের সকলেরি জানা কথা। তাহার অর্থ হইতেছে ভাবের ইন্দ্রপুরী। পৃথিবীতে অনেক ভাবুক কেবল রচনায় যে এই ভাবের ইন্দ্রলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা নহে,—মর্ত্ত্য-লোকেও সেইরূপ ইন্দ্রপুরী রচনার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিল। রস্কিন এক সময়ে Company of st. George নামক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ করিয়াছিলেন, সেখানে সকলে কর্ম্ম

করিয়া পল্লী বাঁধিয়া ধর্ম্মের আদর্শে জীবন রচনা করিবে, জীব-হিংসা করিবে না ইত্যাদি নানা কল্পনা তাঁহার মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহা টিঁকিল না। যাহাই হউক, সেই সভায় শুনিলাম যে কবির এটা একটা নূতন খেয়াল, আধুনিক কালের সঙ্গে না চলিয়া প্রাচীন কালের একটা ব্যাপারকে আধুনিক কালের মধ্যে জোর করিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা—চারিদিক্‌কার প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের মত এ কল্পনা ও উদ্যোগ শুকাইয়া মরিবে।

তখন কবির প্রতি বালকসুলভ অন্ধ ভক্তিবশতঃ বাহি-রের এই .সকল প্রতিকূল সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হইতাম, ভাল করিয়া কোন কথাই বুঝিতাম না। আজ জানি যে কথাটার সত্যতা আছে। কবি-কল্পনা যে টুকু সে টুকু যতই মনোরম হউক্—তাহা একটা বহুলোকসমন্বিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ দিতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ দেয় একমাত্র সচেষ্ট সাধনা, সুদৃঢ় চরিত্রবল। প্লেটো এই কারণে তাঁহার আদর্শ তন্ত্র হইতে কবিকুলকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। জগতে যেখানে কবিরা ভাবসৃষ্টি না করিয়া কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা এই জন্য ব্যর্থ হইয়াছেন ;—স্থায়ী মঙ্গল গড়িয়াছেন মহাপুরুষেরা—যাঁহারা নিছক ভাবলোকবিহারী নহেন।

কিন্তু সেই সমালোচকবর্গ একটি কথা মনে রাখেন নাই। তাঁহারা কবির এই উদ্যোগকে বহু পূর্ব্বের মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের :সঙ্গে মিলাইয়া

দেখেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা-প্রভাবের প্রতিক্রিয়াবশতঃ কবি ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম খাড়া করিতেছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণতঃ সত্য নহে—নিজের জীবনের একটা বড় সামঞ্জস্য স্থাপনের বেদনাতেই এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে—সে একটা আত্মার গভীর অভাব মোচনের গূঢ় ইচ্ছার কাজ—শুদ্ধ য়ুরোপীয় আইডিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের বাহাদুরি করিবার জন্য এত দুঃখ এত ত্যাগের ভিতর দিয়া এত দুঃসহ বিরোধ কাটাইয়া কোনো মানুষ যাইতে পারিত না। অবশ্য আত্মার সাধনার সঙ্গে অনেক বাহিরের জিনিষ জড়াইয়া পড়ে, কিন্তু সে সমস্তই বাহিরের—তাহারা আসে যায় পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে—কিন্তু যে জিনিষটা সমস্ত ভাঙাচোরার ভিতরে বাধাবিঘ্নের ভিতরে একনিষ্ঠ হইয়া কোনো মঙ্গলকে গড়িয়া তুলিতে থাকে তাহা আত্মার অন্তরের জিনিষ। সেই আত্মা আপনার পরমার্থকে পাইবার জন্য সন্ধানে বাহির হইয়াছে বলিয়াই সত্য ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তিমান হইয়া পথ দেখাইতেছে এইটেই আসল কথা। সত্যই পথ দেখাইতেছে বলিয়াই কোনো একটা স্থানে সে স্থির হইয়া নাই, ভিন্ন ভিন্ন নানা অবস্থার ভিতর দিয়া সন্ধানীকে কেবলি সম্মুখে টানিতেছে—বাধা বিঘ্ন ভাঙাচোরা তাহার পথে চালাইবার বড় বড় বাহন আপনাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মার যে বেদনা সে বেদনা একলা কাহারও নহে—সে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই—যখন আমাদের মধ্যে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আমাদের কাজও ম্লান হয়, আবার যখন

তাহা উজ্জল হয় তখনি কাজ সত্য হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে তাহার ক্রিয়া চলিতেছে—সেই ক্রিয়াশক্তিই এই বিদ্যালয়ের মূলশক্তি, এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্বই তাই। যাহাই হউক্ স্বাদেশিক উত্তেজনা নহে, আত্মার বেদনাই কবিকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত সত্য।

মহর্ষি কোন্ জায়গা হইতে এ আশ্রমকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা আজ বুঝা যাইতেছে। তিনি এ আশ্রমকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এই ভাব হইতে যে যিনি একসময়ে এই প্রান্তরে তাঁহার কাছে দীপ্যমান হইয়াছিলেন, তিনি বিবিধ মঙ্গলঅনুষ্ঠানে সকলের কাছে দীপ্যমান হউন্। নহিলে এ আশ্রম তিনি উৎসর্গ করিবেন কেন? দেশের লোক ধর্ম্মলাভ করুক, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনার বিষয় ছিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমকে নিঃসন্দেহই সেই বড় সৃষ্টির দিক্ হইতে দেখেন নাই। তিনি নিজের জোরে নিজের মতে নিজের শাসনেই এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সত্যকে যে পরিমাণে তাহার আপন কাজ করিবার অবসর দেওয়া উচিত—অন্যকে যে পরিমাণে স্বাধীনতা দিলে বিদ্যালয়ের কাজ যথার্থ আন্তরিক সাধনার কাজ হইয়া উঠিতে পারে, তিনি নিজের প্রবল ইচ্ছাবৃত্তিবশতঃ সে পরিমাণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যদিচ তিনি তখন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে লেশমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না তথাপি তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সেই

প্রটগুত্তা ছিল যাহা মঙ্গলশঙ্খ ও সৌন্দর্য্যপদ্মকে বাদ দিয়া কেবল গদার আঘাত ও চক্রের চক্রান্ত দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করাকে সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করিত। সুতরাং শান্তি-নিকেতন আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ অতি অল্প কালেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কবির তখন অন্তরে বাহিরে সংগ্রাম—ঋণ, অর্থাভাব—অথচ বিদ্যালয়ের জন্য সমস্তই তাঁহাকে একলা করিতে হইতেছে। তিনি যখন ঋণের ভারে প্রপীড়িত, তখনই এই আশ্রম তিনি আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ভারের উপর ভার চাপিতে লাগিল। এ কার্য্যটি যে তাঁহার খেয়াল, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কেবল মহর্ষির উৎসাহ ছিল। তিনি যেন দিব্য চক্ষে দখিতেছিলেন যে, যে সাধনা গোপনে পর্ব্বতের গুহার মধ্যে নির্ঝরের মত লুকানো ছিল, সে লোকালয়ে নদীর কল্যাণধারার মত এক্ষণে প্রবাহিত হইয়া চলিল—সে আর একলার নয়, সে এখন সকলের।

দেনা পাওনার সম্বন্ধ ছাত্রদের সঙ্গে রাখিবেন না বটে, তথাপি বেতন লইতে হইল। শিক্ষার আয়োজন এখন বিচিত্র এবং ব্যয়সাধ্য—শিক্ষকদিগের সংসার আছে—তাঁহা-দিগকে বেতন দিতে হয়, সুতরাং ছাত্রদের নিকট হইতে ১৫৲ টাকা করিয়া মাসে মাসে লওয়া স্থির হইল। এখন যেখানে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী আছে, পূর্ব্বে সেখানেই বিদ্যালয়গৃহ ছিল—তার পর এই সময়ে টালির ছাদের ঐ লম্বা ঘরটি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের তখন দুই বৎসর বয়স হইয়াছে।

কবির আত্মীয় এবং সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের ভার এই সময়ে গ্রহণ করিলেন। রমণী বাবু, স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এই তিন জনকে লইয়া একটি কর্তৃসভা গঠিত হইল। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া পড়া শুনা দেখিতেন এবং সকল বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতেন।

তৃতীয় বৎসরে সতীশচন্দ্র রায় এই আশ্রমে আসিলেন। 'গুরু দক্ষিণা' গ্রন্থে এবং তাহার ভূমিকায় তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কিন্তু আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় আরও বেশি করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ তিনি এই আশ্রমের আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

তিনি অল্প বয়স্ক কলেজের ছাত্র ছিলেন কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য্য বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের রসসমুদ্রের মধ্যে তিনি অহোরাত্র ডুবিয়া থাকিতেন; সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা, ফরাসীস্ ও জর্ম্মাণ কবি ও রসজ্ঞদের রচনার ভাবরস সকাল হইতে দ্বিপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ও রাত্রির অনেক প্রহর পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া আনন্দে এমন ভরপুর হইতে কাহাকেও দেখি নাই। যে তাঁহার নিকটে আসিত তাঁহাকে তিনি সেই নেশা ধরাইয়া দিতেন। ব্রাউনিংএর কবিতা সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার আলোচনা পাঠ করিলে

সেই আশ্চর্য্য রসগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ভাবরস তাঁহার কাছে পুস্তকের ছাপা পাতার মধ্যে বাঁধা ছিল মনে করিলে ভুল হইবে, সেই ভাবরসকে তিনি অপর্য্যাপ্ত অফুরন্ত উপভোগ করিতেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে। তিনি যে নেশা ধরাইতেন সে নেশায় আমাদের সকলকে তিনি ক্ষুদ্র আলাপ ও প্রাত্যহিক তুচ্ছতার জঞ্জাল হইতে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-উৎসবক্ষেত্রে বসাইয়া দিতেন, প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথ পূর্ণ হইয়া উঠিত। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—সমস্ত আকাশ যে আনন্দ তাহা আমরা তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলেই এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিতাম।

এ প্রকার সৌন্দর্য্যভোগ প্রায়ই দেখা যায় মানুষকে খুব অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে লইয়া যায়—অনেক কবির জীবনের ইতিহাসে তাহা আমরা দেখিয়াছি। সতীশ এমন প্রবল ভোগী ছিলেন, অথচ আত্মত্যাগ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল। যখন ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহার নিঃস্ব অবস্থায় যাহা থাকিত তাহাই দান করিয়া বসিতেন, ছেঁড়া মলিন বস্ত্র পরিয়া ও মাদুরে শয়ন করিয়া কাটাইতে তাঁহার কষ্টবোধ হইত না। কলিকাতায় তাঁহার বাসায় তাঁহার হতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া দৈন্যদশা দেখিলে সেখানে বসিতে ইতঃস্তত করিতে হইত। দারিদ্র্য যে তাঁহাকে ভয়ঙ্কররূপে ঘিরিয়া আছে তাহা সেই নিয়তরসপিপাসু কবিটি বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেনই না। আনন্দের সম্পদ তাঁহার এতই অধিক পরিমাণে ছিল।

তাঁহার বিদ্যালয়ে আত্মোৎসর্গ এক দিনেই স্থির হইয়া গেল। তাঁহার পরিবারে ঘোরতর দৈন্যদশা, পরীক্ষা দিয়া মানুষ হইলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে ইহাই সকলের আশা করিয়াছিল, তিনি এখানে আসিয়া আপনাকে নিঃশেষে দান করিলেন। অথচ সে ভাব তাঁহার মনেই ছিল না, তিনি বরাবরই ভাবিতেন যে তিনি অত্যন্ত অযোগ্য, কৃপা-পাত্র—নিজের সম্বন্ধে লেশমাত্র অভিমান তাঁহার মধ্যে কোন দিন কেহ দেখেন নাই।

কলিকাতার বাসাবাড়ীর মলিন, অন্ধকারপূর্ণ, দারিদ্র্যময় গৃহকোণকে যে স্বর্গলোক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কাছে বোলপুর তো স্বর্গেরও বাড়া। শিশু যেমন তাহার মাতৃদুগ্ধ অহোরাত্র শোষণ করিরা বাড়ে, তিনি এই আশ্রমপ্রকৃতিকে এই আদর্শকে এই কর্ম্মকে আনন্দকে শোষণ করিয়া দিনরাত রসে, মাধুর্য্যে, ঔদার্য্যে, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রহিলেন। না তাঁহার কাজের বিরাম ছিল, না তাঁহার রচনার বিরাম ছিল, না সৌন্দর্য্য উপভোগের বিরাম ছিল। আশ্রমবালকদের মধ্যে সেই আনন্দের বিদ্যুৎসঞ্চার তিনি করিয়াছিলেন, তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত যে তাহারা পৃথিবীমাতার স্পর্শ পাইতেছে। বুঝা যাইত Three years she grew in sun and shower -এর কবি মিথ্যা কথা লেখেন নাই।

তাঁহার অধ্যাপনা তেজে আনন্দে আবেগে এমনি পরিপূর্ণ ছিল যে তাহা ভাবসৃষ্টিরই মত বোধ হইত। তাঁহার আনন্দ যে কি প্রচণ্ড কি প্রবল কি ভয়ঙ্কর তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য

নাই—কারণ দুঃখের বিষয় আমাদের সাক্ষ্য ব্যতীত তাহার নিদর্শন সামান্য। পুঁথির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-মনের সত্য উদ্বোধন কার্য্য যাহাতে হয়, সেই দিকে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। সতীশের অধ্যাপনায় সেই কাজটি হইত। তিনি বাংলা পড়াইতেন,—যেখানেই রচনার মধ্যে কোন বর্ণনার আভাস আছে সেখানে তাহার স্ফুটনে বালকদিগকে লাগাইতেন, তাহারা মানসচিত্রে সমস্তটা দৃশ্যের খুঁটিনাটি আশপাশ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়া লইতেন; এম্‌নি করিয়া তাহাদের কল্পনাবৃত্তির বোধন হইত। ছন্দ শুনাইয়া ছন্দবোধ এবং ছন্দরচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিতেন। সাহিত্য পড়াইতে গেলে যে তাহার ভিতরের আসল জিনিষ রসবোধ কি করিয়া সঞ্চারিত করিতে হয় তাহা ইনি জানিতেন আশ্চর্য্যরূপে। প্রকৃতিগ্রন্থেও ছাত্রদের অভিনিবিষ্ট করিতে এই প্রকৃতির ভক্তটি ওস্তাদ্ ছিলেন। তাহাদের কাছে প্রকৃতির একটি রূপও অগোচর থাকিত না, প্রতিদিনের আব্‌হাওয়া—সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান—মেঘবৃষ্টি, ফুলফলের উন্মীলন, পক্ষিপরিবারের নানা কথা—সমস্তই চোখের সাম্‌নে মেলা ছিল। "কোথা গির্‌গিটি বাহিরিয়া আসে, মাথার জটার করাত প্রকাশে," এবং "কোথায় গোসাপ, খরজিভ্ লুহি লুহি ধীরে চলে, সেথায় শুক্‌নো পাতাগুলি-তলে"—তাহাও

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জানা ছিল। বর্ষায় তাহারা বাহির হইত, জ্যোৎস্না রাত্রে কে তাহাদের ঘরের মধ্যে রাখিবে? বৈশাখের ঝড়ে তাহারা ধুলায় গড়াগড়ি যাইত—তিনি তাহাদের উপভোগকে, কল্পনাকে, হৃদয়কে, এম্‌নি করিয়া জাগাইয়া ছিলেন। গুরু দক্ষিণা যদি কেহ ভাল করিয়া পড়েন, তবে এই কথার পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন, কারণ ও বইটি যেন আশ্রমেরই স্বহস্তের রচনা।

অবশ্য প্রতিভা আমাদের অদৃষ্টে সকল সময় জুটিবে না তাহা জানি, সুতরাং সেজন্য আক্ষেপ মিথ্যা। কিন্তু আমি গোড়াতেই বলিয়াছি যে এ আশ্রমের মর্ম্মগত সাধনা একটি আছে, যাহা ইহার আদিগুরু মহর্ষির সাধনা ছিল। সে হচ্ছে সত্যের কাছে ফলাফল বিচারহীন আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ নিজের অহংকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া। নিজের দিকে কিছুই না টানিয়া রাখিয়া, সত্যের দিকে সমস্তই মেলিয়া ধরা। ত্যাগ যদি ধনের ত্যাগ বা আনন্দের ত্যাগ হয়, আরামের বা সুখের ত্যাগ হয়, তবে তাহা সত্য ত্যাগ হয় না, তাহা ত্যাগের বাহিরের রূপ হয় মাত্র কারণ সত্য ত্যাগ একমাত্র আত্মত্যাগ। আপনাকে ভোলা। সতীশের সেই আপনাভোলা ত্যাগ ছিল—সেই দিক্ দিয়া—প্রতিভার দিক্ দিয়া নয়—তিনি আশ্রমের এত ভিতরে গিয়াছেন। তাঁহাকে দিয়া আমাদের আদর্শের সত্যতা ও তাহার যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষবৎ বুঝিবার সাহায্য হইয়াছে।

উপাধ্যায় মহাশয়ের সময়ে ছাত্রগণ কঠোর নিয়মসংযমে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া বলিষ্ঠ হইবার দিকে উৎসাহ

পাইয়াছিল। সতীশের সময় সে শিক্ষা পূরাপূরি ছিল এবং সেই সঙ্গে আনন্দের শিক্ষা, বিশ্ববোধের শিক্ষা আসিয়া আশ্রমকে কেবল বাহিরের দিক্ হইতে নয় ভিতরের দিক্ হইতে গড়িয়া তুলিল। সতীশের সহযোগীগণ অনেকেই খুব পৌরুষভাবাপন্ন দৃঢ়চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সুতরাং অভ্যাসের দিক্ হইতে তাঁহারা বালকদিগকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছিলেন। দুয়ের সামঞ্জস্যে তখন আশ্রমশ্রী চমৎকার খুলিয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে উপাধ্যায় মহাশয়ের বিদায়ের পরে মোহিতবাবু প্রভৃতি কয়েকজনে বিদ্যালয়ের চালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহিতবাবু বিদ্যালয়কে কিরূপ সাহায্য করিতেন কবি-লিখিত তাঁহার স্মৃতিরচনায় আপনারা তাহার পরিচয় পাইবেন। বিদ্যালয়ের কিসে মঙ্গল হইবে সেদিকে তাঁহার সর্ব্বদাই চিন্তা ছিল। তিনি পণ্ডিত ও ভাবুক ছিলেন, তিনি ইহাকে দেশেব বর্ত্তমান কালের প্রয়োজনের দিক্ হইতে এবং ভারতের চিরন্তন সাধনার দিক্ হইতে খুব বড় করিয়া দেখিতে পারিতেন। ১৩১০ সালের মাঘে সতীশ যখন অকালে বসন্তরোগে এই আশ্রমে মারা গেলেন, তখন মোহিতবাবু তাঁহার কলিকাতার অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়া যোগ দিলেন। তখন কিছুকালের জন্য শিলাইদহে বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। মোহিত বাবু সেইখানে গিয়া বিদ্যালয়ের কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন।

১৩১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় বোলপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন মোহিত বাবু অধ্যক্ষ। মোহিত বাবু শিক্ষা-

বিজ্ঞান সম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার কাজে তখন লাগিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি মোহিত বাবুর অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। অনেক দিন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "কলেজে যত দিন পড়িয়াছি ততদিন কিছুই শিখি নাই, কলেজ হইতে বাহির হইবার পরে বিদ্যামন্দিরের মধ্যে একটু আধটু প্রবেশ লাভ করি।" এ বিদ্যালয়ে আসিয়া তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল এই যে, ইয়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাকে আমরা আমাদের জ্ঞানলাভের প্রণালীর ভিতর দিয়া কি উপায়ে পাইব। তিনি পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া পুঁথির শিক্ষার খুব ফলাও আয়োজনের দিকে তাঁহার স্বভাবতঃ ঝোঁক ছিল। তিনি যে পাঠাসূচী তৈরি করিয়াছিলেন, তাহা যদি আজ থাকিত তবে আপনারা দেখিতে পাইতেন যে সেরূপভাবে শিক্ষা দিতে গেলে, শিক্ষকের কি পরিমাণ বিদ্যা বুদ্ধি আবশ্যক। সকল বিষয়েই খুব বড় রকমের আয়োজন মোহিত বাবু খাড়া করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় মোহিত বাবু ছেলেদের গল্প বলিতেন। বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতেই সন্ধ্যার অবকাশকাল এখানকার ছেলেরা নিজেরা একটা প্লট্ খাড়া করিয়া হেঁয়ালীনাট্য রচনা করিয়া নিজেরা অভিনয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধচর্চ্চাও হইত। চট্ করিয়া চোখে দেখিয়া একটা জিনিষের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বলা, হাতে অনুভব করিয়া কোন্ জিনিসের ওজন বলা, অনেকগুলো জিনিষ এক পলকের মধ্যে দেখিয়া কতকগুলি এবং কি কি দেখিয়াছে তাহা বলা, ইত্যাদি উপায়ে

তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করানো হইত। জগদানন্দ বাবু, সুবোধ বাবু, সত্য বাবু প্রভৃতি সন্ধ্যার এই অবকাশ ছেলেদের গল্পে গানে আমোদে প্রমোদে পূর্ণকরিয়া রাখিতেন।

কিছু কাল এই ভাবে চমৎকার চলিল। কিন্তু মোহিত বাবু পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া এবং বরাবর যে ভাবে অন্যত্র কাজ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে বাহিরের কোন আয়োজনের অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে পীড়া দিত। তিনি বড় ছেলেদের ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন এবং অনেক ছেলে ভর্ত্তি করিয়া বিদ্যালয়কে হঠাৎ বড় করিবার দিকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বয়স্ক ছেলের দল জুটিল, ছাত্র সংখ্যাও ২০।২৫ টি হইতে প্রায় ৫৫টিতে গিয়া ঠেকিল। মোহিত বাবুকেই তখন বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ দেখিতে হইত, হিসাব পত্রও রাখিতে হইত,—যিনি চিরকাল দর্শন ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে হঠাৎ ভাঁড়ারে রান্নাঘরে অষ্টপ্রহর টানাটানি করিয়া কোন বিশেষ লাভ হইল না—তা ছাড়া তিনি এমন অমায়িক ও শিশুপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে সবদিক্‌কার রাশ বাগাইয়া চলিতে একেবারেই অক্ষম ছিলেন। সুতরাং দার্শনিক পণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক এবং সুদৃঢ় কর্ত্তা না হইতে পারায় নানা দিকে গোল যোগ বাধিল। অনেক ছেলে হইল, তাহাদের ব্যবস্থিত করিবার শক্তি ছিল না, অধ্যাপকগণের মধ্যেও যোগবন্ধন দৃঢ় হইল না। বিদ্যালয়ের হঠাৎ বৃদ্ধিটা একটা অমঙ্গলজনক ব্যাপার হইল।

মোহিত বাবু অনুভব করিলেন যে বিদ্যালয়কে বিদ্যার দিক্ দিয়া তিনি যে ভাবে পূর্ণাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এ অবস্থায় সম্ভাবনীয় নহে। তাহার একটা প্রধান কারণ, সকলেই এক আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়। বরাবর এখানে এই একটি প্রতিকূল অবস্থা থাকিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ এই, যে এটা ইস্কুলও বটে, আশ্রমও বটে। যেখানে ইস্কুল সেখানে পড়াইবার মাষ্টার চাই, অথচ মাষ্টার হইলেই যে তিনি গুরু হইবেন এমন কোন কথা নাই। এ স্থলে রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "এ কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের যে সঙ্গতি আছে, অবস্থাদোষে তাহার পূরাটা দাবী না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। * * (ইস্কুলের) শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে।" এ কথা আংশিক ভাবে সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই 'স্বভাবতই'টার ব্যতিক্রমও ঘটে—দাবী করিলেও দাবী মিটানো অনেকের পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব হয়। তখন হয় তাহাকে ভড়ং করিতে হয়, নয় সত্য দাবী মিটাইতে গিয়া সে আদর্শকে নিজের ক্ষুদ্রতার দ্বারা ম্লান করিয়া বসে।

যাহাই হৌক্ মোহিত বাবু বুঝিলেন যে বিদ্যালয়ের অন্তরতরস্থানে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহার পর একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন কিন্তু সুস্থ হইয়া আর বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন না, বাহির

হইতে যোগ রাখিলেন। ১৩১১ সালের মাঝামাঝি তিনি বিদ্যালয় ছাড়িলেন।

মোহিত বাবুর যাইবার সময় বিদ্যালয়ে খুব একটা বড় রকমের ভাঙচুর হইয়া গেল। তখন এমন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে সকলেরই মন দোলায়মান ছিল যে, অনেকেরই মনে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং আসিয়া বিদ্যালয়ে বাসা বাঁধিলেন। তিনি স্থায়ীভাবে এখানে থাকিয়া সকল কর্ম্মের ভার লইবার জন্য এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইবার জন্য বিদ্যালয়ের মাথার উপর হইতে সংশয়ের মেঘ একটু একটু করিয়া কাটিতে লাগিল। অধ্যাপকদিগের প্রত্যেককে অধ্যয়নে অনুশীলনে ও রচনাকার্য্যে উৎসাহ দিলেন, যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ তাঁহাকে সেই বিষয়ে পুস্তক আনাইয়া দিয়া পরামর্শ দিয়া আলোচনা করিয়া সেই অনুরাগকে পূরাপূরি কাজে লাগাইয়া দিলেন। অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত করিলেন—তাহাতে নানাবিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রধর্ম্ম সকল বিষয়ে পাঠ এবং কথাবর্ত্তা হইত—তাহার কিছু কিছু রিপোর্ট আমাদের পরলোকগত বন্ধু সত্যেন্দ্র বাবু রাখিয়াছিলেন,—হয়ত কোথাও না কোথাও সে খাতাগুলি এখনও আছে।

ক্লাসে ক্লাসে গিয়া রবীন্দ্রবাবু বসিতেন এবং নিজে পড়াইয়া কি ভাবে ভাল পড়ানো যাইতে পারে তাহা দেখাইতেন। ইংরাজী বাংলা দুই ভাষাই তিনি নিজে কোন কোন ক্লাসে পড়া-

ইতেন। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপক দিগের সহিত পাঠপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

এখানে আমার একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ বিদ্যালয়ে একটি ভাব ইহার আরম্ভ কাল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে কোন উচ্চনীচের অসামঞ্জস্য নাই। সেই জন্য কাহাকেও হেড্ মাষ্টার বা কর্ত্তৃপদ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য রবীন্দ্র বাবু নিজে ভারগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবটি কিছু কিছু আঘাত পাইয়াছিল। কবি নিজে কোন দিন কোন অধ্যাপককে অনুভবমাত্র করিতে দেন নাই যে, তিনি প্রভু এবং অধ্যাপকেরা তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিবেন। তিনি বরং বরাবর যে আসনটি কামনা করিয়া আসিয়াছেন, সে আসনের প্রতি আমাদের কাহারও কোন লোভ বা আকর্ষণ থাকিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার ভাব এই যে আমরা সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছি—ছাত্র এবং অধ্যাপক এবং স্থাপয়িতা সব আমরা এক জায়গায় বসিয়া গিয়াছি। সুতরাং অধ্যাপক কেবল শাসন করেন, ছাত্র শাসিত হয়—অধ্যাপক উচ্চে, ছাত্র নীচে এ ভাবটিও এ বিদ্যালয়ের ভাব নয়—কারণ বয়সে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক বড় হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান—সেখানে সকলেই সকলের সহায় ও বন্ধু। বিদ্যালয়ের সকলের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধটি যাহাতে স্থাপিত হয়, তজ্জন্য এখানে প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, কি করিয়া সকলের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্টতর হয় সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এখানে

কাহারও কাজ মাথার, কাহারও কাজ হাতের, কিন্তু তাই বলিয়া কোন অঙ্গের সঙ্গে কোন অঙ্গের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নাই—সবাই যে এক কলেবরবদ্ধ এ বোধের কোথাও ব্যত্যয় নাই। ইহার অনেক দিকেই অনেক অসুবিধা আছে, তাহা জানি—কিন্তু তথাপি এ ভাবকে না রক্ষা করিলে আশ্রমের আদর্শই পীড়া পায়—আশ্রম আর আশ্রম থাকে না, তাহা আপিস হইয়া দাঁড়ায়। তখন মঙ্গলের স্থানে যন্ত্রের আবির্ভাব হয়।

১৯০৭ সালে যে বালকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা বিদ্যালয়ের এই ভাবটিতে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাহারা উচ্চ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস অনেক দূর পর্য্যন্ত অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। রবীন্দ্রবাবু নিজে কিছুকাল ইহাদিগকে সাহিত্য পড়াইয়াছিলেন।

ইহা হইতে আর একটি জিনিষ বিদ্যালয়ের চোখের সাম্‌নে দেখা দিল। ছেলেদের লইয়া যে সকলরকম আলোচনাই করা যায় এবং তাহা যে তাহাদের মনের পরিণতির পক্ষে খুবই সহায়তা করে, সে কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাহার কারণ তাঁহারা ছেলের মনোরাজ্যের সকল খবর রাখেন না। অসংহত জ্যোতির্বাষ্পে এবং পিণ্ডীকৃত সংহত তেজঃপুঞ্জ নক্ষত্রে—অর্থাৎ nebulaতে এবং নক্ষত্রে যে প্রভেদ বালকের মনে এবং পরিণত মনে কেবল সেই প্রভেদ। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই কথা বলিতে হইবে, যে যেহেতু জ্ঞানের ও অনুভূতির বিষয়সকল তাহার মনের মধ্যে সংহত

আকার প্রাপ্ত হয় না—ছাড়া ছাড়া ভাবে বিক্ষিপ্ত এবং আহ্‌-ছায়া ভাবে থাকে, অতএব তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তিকে কেবল রাঙাছবি আর আরব্যোপন্যাস দিয়া ভুলাইতে হইবে আর তাহার চেয়ে বড় কিছুই দেওয়া হইবে না, কারণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে সে সমস্তই তাহার ধারণার অগম্য ? সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া অন্ততঃ আমাদের সংস্কারের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া দেখিবার কি কোন প্রয়োজন নাই ? ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক স্থানে এখন উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী সাহিত্য হইতে বালকোপযোগী অংশ সকল চয়ন করিয়া পড়ানো হয়—খুব নীচের ক্লাশেই সেক্সপিয়র, রস্কিন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি পড়ানো হইতেছে। ইতিহাস ভূগোল মিশাইয়া সমস্ত জগৎ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ শিশুদের কাছে দিবার চেষ্টা হইতেছে, বিজ্ঞানের সকল ব্যাপার সাধারণবোধগম্য করিবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক মহারথীও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। হেল্‌ম্‌হজ, টিণ্ডাল, লাবক্‌ প্রভৃতি সেই কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডে, জর্ম্মানীতে ও আমেরিকায় যদি শিশুকে শিশু বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া রাঙা ছবি দিয়া ভুলানো না হয়, তবে আমরাই কেন শিক্ষাকে কেবল নীরস ও শুষ্ক করিয়া রাখিব তাহা তো বুঝি না। সার অলিভার লজের ন্যায় কড়া বৈজ্ঞানিকেরও School teaching and school Reform নামক গ্রন্থে এই কথা লেখনীতে বাহির হইয়াছে যে শিক্ষার আদর্শ কেবল খবর দেওয়া নহে কিন্তু মানসশক্তির উদ্বোধন করা—সুতরাং ক্রমাগত সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে

অধীত বিদ্যা বিদ্যার্থীর স্বকীয় জিনিস হইতেছে কি না, অর্থাৎ তাহার উপরে তাহার এমন দখল জন্মিতেছে কি না যাহাতে সে তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে পারে। সাহিত্য পড়িয়া যদি রসবোধ না হয়, বিজ্ঞান শিখিয়া যদি অনুসন্ধিৎসা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রবৃত্তি না জন্মে, তবে কি শিক্ষা হইল ?

যাহাই হৌক্, বিদ্যালয় তখনকার ছাত্রদের অনেক জিনিস নির্ব্বিচারে দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যদিও তাহাকে বেশ সুবিহিত প্রণালীর মধ্যে বদ্ধ করিতে পারে নাই।

এমন সময়ে ১৩১২ সালে সমস্ত বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে আন্দোলনে বিস্তর সাময়িক উন্মত্ততা ঘটিলেও দেশ যে কত বড় সত্তা, তাহার আকর্ষণ যে কি প্রচণ্ড, সংসারের স্বার্থ খ্যাতিপ্রতিপত্তির আকর্ষণ যে তাহার কাছে কতই সামান্য এই একটি নূতন অনুভূতি সকলকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। এই ভাবের বাষ্প দেশের আকাশময় ছড়াইয়াছিল, তাহা আমরা উপাধ্যায় মহাশয়ের কথাতেই দেখিয়া আসিয়াছি, তবে সেই বিক্ষিপ্ত বাষ্প যে এমন করিয়া জমাট্ বাঁধিয়া হঠাৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তাহা কেহই কল্পনা করেন নাই। যাহাই হউক, শান্তিনিকেতন আশ্রমের বন্দরে দেশের চিত্তসমুদ্রের এই ক্ষুব্ধ ঝটিকার তরঙ্গের অভিঘাত লাগিবার কোন কারণ ছিল না, সাময়িকতা সেখানে বারম্বার প্রতিহত হইল।

শান্তিনিকেতন তাঁহাকে ফিরাইল বটে, কিন্তু শান্তিনিকে-

তনবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই শান্তিনিকেতনের শান্তং শিবং অদ্বৈতং এর সাধনা এমন করিয়া গ্রহণ করেন নাই যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে দেশকে ফিংাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। অবশ্য যখনি তাঁহারা সংযমের রাশকে আল্গা করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, শান্তিনিকেতনের তর্জ্জনী তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছে। কিন্তু তখন যে তাহা অনেক সময়ই ভাল লাগে নাই এবং অনেক সময় বিরোধ জাগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

তাহার কারণ ছিল। তখন মনে করিতাম যে সমস্ত দেশকে সমাজকে ছাড়িয়া যে ধর্ম্মের সাধনা যে অত্যন্ত অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট অর্থাৎ বস্তুবিচ্ছিন্ন সাধনা, চারিদিক্‌কার সমস্ত শক্তির তরঙ্গলীলা হইতে দূরে নিভৃতির মধ্যে বন্দর গড়িয়া বাস করার মধ্যে একটা ভীরুতা আছে। তাহার যেন আপনার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহস নাই, ভরসা নাই—তাহার প্রাণ এতই ক্ষীণ! এমনতর অপবাদ কোন কোন মহলে প্রচারিতও হইয়াছিল যখন রবীন্দ্র-নাথ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া কিছু দিন বাদে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিলেন যে, এরকম ধর্ম্ম সৌখীন ধর্ম্ম, পাছে কোথাও সংসারের আঁচ লাগে এই ভয়ে ভয়ে সে পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়। ভালমন্দ, পাপপুণ্য, সমস্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া যদি বলিতে পার, যে এখানেও স্বর্গের আনন্দ স্বর্গের গন্ধ পাইতেছি, তবেই বুঝি ধর্ম্ম সত্যপদার্থ হইয়াছে!

তখন আমরা নিজেরাই এ সকল কথা এইদিক হইতে ভাবিয়াছি এবং অধীর হইয়াছি। এখন উত্তেজনার অবসানে দেশই ক্রমে এই কথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে আন্দোলনের সময়ে সে দেশেরই বিপরীত সাধনাকে বড় করিয়াছিল। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সভ্যতার মর্ম্মগত একটি মনুষ্যত্বের আদর্শ আছে, যাহাকে সে নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, নানা পরীক্ষা, আন্দোলন উদ্যোগ বিপ্লব যুদ্ধের মধ্য দিয়াও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ইউরোপ সেই আদর্শের নাম দেয় ফ্রীডাম্। তার মানে যে কোন মানুষ মনুষ্যত্বের সকল অধিকারে অধিকারী হইবে—কিন্তু ইউরোপ আজও মনুষ্যত্বের অধিকার বলিতে নেহ্য অধিকার, বিষয়ের অধিকারই বুঝিয়া থাকে। ইউনিভার্সাল্ সাফ্রেজ্ মানে সকলের ভোটের সমান অধিকার্, রাষ্ট্রতন্ত্রে অধিকার—সুতরাং ইউরোপের ভিতরের সকল চেষ্টাই পোলিটিক্যাল ভিত্তির উপর ভর করিবার প্রয়াস পায়। আমাদের দেশের মর্ম্মগত আদর্শ স্বতন্ত্র—সে চায় ভিতরের ফ্রীডাম্—বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি। যেনাহং নামৃতা-স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—তাহার এই বুলি। সে তাই পরিবারকেও বলে বন্ধন, সমাজকেও বলে বন্ধন, রাষ্ট্রকেও বলে বন্ধন, এবং নেশনকেও যে সে পরমপদার্থ বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। মায়াবাদী ভারতবর্ষ মায়াকে কেবলি ছেদন করিয়া করিয়া সমগ্রকে আত্মাকে উপলব্ধি করিবে—তাই সে বলে যে একটি একটি করিয়া কোষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে হইবে। আত্মা প্রজাপতির মত

নানা অবস্থার মধ্য দিয়া যাইবে—কোন গুটিই তাহার শেষ আশ্রয় হইবে না। চতুরাশ্রম এই জন্য তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং আজও করিতেছে। যদিও তাহার সমাজ এখন দ্বিজত্বকে জন্মের জিনিস করিয়াছে, সাধনার জিনিস নয়, এবং ব্রহ্মচর্য্যকে তিন দিনের ব্যাপার করিয়া একটি মাত্র আশ্রমকেই যত সকালে আশ্রয় করিয়া বসা যায় তাহার উপায় স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সংসারে ঢুকিলেই তাহার পরমা তৃপ্তি—ইহাই তাহার পরমলোক, ইহাই তাহার পরমানন্দ। এইখানে শেষ দিন পর্য্যন্ত কড়ি জমাইয়া কড়ি গুনিয়া মরাই বর্ত্তমান সমাজের পরম পুরুষার্থ। তথাপি এই আদর্শ যখন আমাদের সভ্যতার মর্ম্মাগত আদর্শ, তখন এক দিক্ দিয়াই শিক্ষাকে সমাজকে সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যোগকে গঠন করিতে হইবে—যুক্তির দিক দিয়া ধর্ম্মের দিক্ দিয়া সব গড়িতে হইবে—সমস্ত সাধনাই সেই ধর্ম্মলাভের সাধনা তাহারি সোপান-পরম্পরা হইবে। শান্তিনিকেতনের ইহাই আদর্শ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে এই আদর্শ কাজ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই যখন দেখি যে তিনি সমস্ত জীবনের সকল কর্ম্ম-কেই ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন,—অথচ তাহার রূপটি কোন মতেই বৈদেশিক হইতে দেন্ নাই—আমাদেরি দেশীয় রূপ রক্ষা করিয়াছেন যথাসম্ভব। অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠেয় ব্যাপারকেই এমন করিয়া প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া অথচ তাহার অগ্রহণীয় অংশকে পরিবর্জ্জন করিয়া লইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদর্শ যে কি ছিল

তাহা বুঝিতে কিছু মাত্র বাকী থাকে নাই। তাই দেশকে জানা এবং সেবা করা যে ধর্ম্মকে বাদ্ দিয়া কেবল উত্তেজনা ও উন্মত্ততাকে বিস্তার করিয়া হইবেনা আন্দোলনের অবসানে সে কথা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান জাগিল, তাহা যে অল্প সময়েরই মধ্যে প্রাণহীন ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে, সেকি কেবল উৎসাহের অভাবে? আমি বলি, ধর্ম্মের অভাবে, চরিত্রের অভাবে, ভারতবর্ষের যথার্থ সাধনার সঙ্গে যোগের অভাবে। আমাদের বুদ্ধির সূক্ষ্ম নৈয়ায়িকতা, যাহা মিথ্যাকেও সত্যের পোষাক পড়াইতে লজ্জিত হয় না, আমাদের ভেদবুদ্ধি, যাহার নির্লজ্জ মূর্ত্তি এই আন্দোলনেই সর্ব্বাপেক্ষা চোখে পড়িয়াছে, ব্যবধান নূতন করিয়া শক্ত করিয়া এবং পাকা করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আমাদের চরিত্রের একান্ত অভাব, যাহা মিলিতে পারেনা মিলাইতে পারেনা, আপনাকে খর্ব্ব করিতে জানেনা, স্বার্থ ও বিদ্বেষবুদ্ধিকেই আঁকড়িয়া থাকে, —প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে এই সকল পাপ কি জাগে নাই এবং তাহারি বিকারলক্ষণ কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি না? কোন উদাহরণে প্রয়োজন নাই নিজেদের দিকে তাকাইলেই উদাহরণ মিলিবে এবং আপনারা সকলেই আমার কথার সাক্ষ্য দিবেন।

জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হইবার প্রস্তাব সেই সময়ে চলিতেছিল। নানা কারণে তাহা হয় নাই। হইলেও ভাল হইত কিনা সন্দেহ। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয় যে

ভাব হইতে উঠিয়াছে, শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্ম সে ভাব হইতে হয় নাই, তাহা আমি প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছি। আমি তো ১৩০৮ সালে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই কথা বলিতেই নারাজ—আমি বলি যে শান্তিনিকেতন আশ্রমই পূর্ব্বে ছিল, কালের গতিকে এবং অসম্পূর্ণতার বেদনায় বিদ্যালয় তাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে মাত্র।

অথচ ১৩১২। ১৩১৩ সালে বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যে এমন একাত্ম সেই অত্যন্ত সত্য কথাটাই আমরা ভুলিয়াছিলাম। সুতরাং উত্তেজনা হইতে বাধা পাইয়া ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে মঙ্গলচর্য্যার স্থানে রাজা বলিয়া আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতে হইল। ১৩১৩ হইতে ১৩১৪ ও ১৩১৫ এর আরম্ভ পর্য্যন্ত এই একটা কঠোরতার পর্ব্ব চলল। বিধাতার সৃষ্টি যে কি তাহা আমরা জানিনাই—আমরা ছোটখাট প্রবালদ্বীপ রচনা করিতে বসিয়া গেলাম।

অধ্যাপকগণের মধ্যে তিনজন অধিনায়ক হইলেন,—ছাত্রগণের মধ্যেও নায়কতার নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম—বাঁধাবাধি, কশাকশি, বিচার, দণ্ডবিধান—সব কড়াক্কড় রকম ব্যবস্থা হইল। সুখ, আরাম কোথায় গেল—তাহাকে কঠোরতার চাপে একেবারে পিষিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

তখন অধ্যাপকগণ হয় দেশের সেবার ভাবে উদ্বোধিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কিম্বা ব্যক্তিগত প্রকৃতিঅনুসারেই হয় ত—সকলেই এই ডিসিপ্লিনের জীবনটাকেই বড় জীবন বলিয়া বোধ

করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন উগ্র নীতিপরায়ণ ছিলেন যে ছেলেদের ক্রমাগত নীতি বাহির হইতে চাপাইয়া এবং তাহার সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর আলোচনা করিয়া দেওয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। ছেলেরাও বাহির হইতেই সব বিষয়ে সাড়া দিত, কিন্তু তখনকার আবহাওয়া যে খুব নির্ম্মল উদার ছিল এমন তো মনে হয় না। একটি কথা তখন ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল যে, বাহিরের নিয়মে মানুষ গড়ে না, তাহাতে মানুষ বড়জোর নীরস ও আচারপরায়ণমাত্র হয়, ভিতরের শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন না হইলে নিয়মের নিগড় নিগড়ই থাকিয়া যায়—তাহা আনন্দের জিনিস হয় না। নিয়ম তো থাকিবেই, কিন্তু তাহার রূপ আনন্দের রূপ হওয়া চাই—সে যেন আনন্দেরই বাহিরের প্রকাশ।

সেই আনন্দ আমাদের মধ্যেই তখন ছিল না। আমরা ভিতরের অভাব বাহিরের উগ্র কর্ম্মপরায়ণতার দ্বারা চাপা দিয়া নিজেকে ভুলাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। আমরা তখন এমন সকল নিয়ম ও অনুষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম, যাহা বাহ্যকঠোরতার একেবারে চূড়ান্ত। ছেলেরা বাসন মাজিত, রান্নাঘরের কাজ করিত, দরিদ্রসেবা করিত, ভুবনডাঙ্গা গ্রামের শিক্ষা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। প্রত্যহ বৈকালে কয়েকটি স্বেচ্ছাব্রতী বালক ভুবনডাঙ্গা গ্রামে গিয়া সেখানকার ছেলেদের পড়াইত। আর কয়েকজন তাহাদের ঘরে ঘরে বসিয়া রোগীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিত। সন্ধ্যায় অধ্যাপকগণ পালাক্রমে গ্রামবাসীদিগকে একত্র করিয়া মহাভারত,

রামায়ণ ও ইতিহাসের কথা শুনাইতেন। প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিত এই গ্রামের কাজ চলে। গ্রামের এ কাজ যে চেষ্টার শৈথিল্যের জন্য সফল হয় নাই তাহা নহে, গ্রামবাসীগণ এ সম্বন্ধে এক বৎসর নিয়মিত কার্য্য সত্বেও একদিনের জন্যও উৎসাহ বোধ করে নাই এবং ইহাতে তিলমাত্র আগ্রহ দেখায় নাই। গ্রামের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ে কোন বিষয়েই মিলামিশা নাই—হিন্দুর মধ্যে হাড়ি ডোম ভিন্ন আর কোন বর্ণ নাই এবং তাহাও স্বল্প কয়েকটি ঘর। ছেলেরা গ্রামের সকল বিষয়ে Statistics লইয়াছিল, দরিদ্রদের ঘর ছাইয়া দিয়াছিল, সকল গ্রামবাসীর পরিচয় লাভ করিয়াছিল—এজন্য ছেলে এবং অধ্যাপক সকলেরি অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমার তো খুব মনে হয় যে ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া এই রকম মনুষ্যসেবার কাজ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটা অঙ্গ বরাবরই হওয়া উচিত। পশ্চিমদেশীয় ধর্ম্মবিদ্যালয়মাত্রেই পরসেবার কাজ একটা বড় অঙ্গ। ব্যাপ্‌টিষ্ট, মেথডিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান্ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে যুবকেরা গ্রামে গ্রামে, লণ্ডনের স্লাম্‌সে কাজ করিতে যায়। ইউরোপে হ্যুমানিটি কথাটা যে একটা কাব্যের কথামাত্র নয়, এবং আমাদের দেশের মত তাহার চর্চ্চার ক্ষেত্র সেখানে যে কেবল আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যেই আবদ্ধ নয় তাহা সম্প্রতি Holmes প্রণীত London Public Courts নামক একট পুস্তক পড়িলে এক মুহূর্ত্তে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। ইউরোপ যে কোথায় আমাদিগকে জিতিয়া

আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। জ্ঞাতীগোষ্ঠী ছাড়াইয়া স্বদেশবাসীর প্রতি প্রীতি ও তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসের ভাব খানিকটা বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ের দ্বারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এ জিনিসটা—এই পরসেবার ভাবটি আধুনিক বিদ্যালয়ের মর্ম্মগত জিনিস হওয়া চাই। আমাদের প্রাচীন আশ্রমে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত একাত্মকতা ছিল আশ্রমের ভিতরকার জিনিস, তখন মন্ত্র ছিল এই :—

যো দেবোঽগ্নৌ যোপ্সু যো বিশ্বম্ভুবনমাবিবেশ
যঃ ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

অগ্নিতে জলেতে বিশ্বভুবনে যিনি অনুপ্রবিষ্ট, ওষধিতে বনস্পতিতে যিনি, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার। অগ্নি জলের সঙ্গে তখন প্রত্যক্ষ ব্যবহারের নিত্য পরিচয়, ওষধি বনস্পতির সঙ্গেও তাই—সুতরাং তাহাদের মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়া বিশ্ববোধে পূর্ণ হইয়া বিশ্বকেও ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে আবৃত করিয়া দেখা তখনকার কালের বিশেষ সাধনা। এখনকার কালে সে মন্ত্রও বলবৎ—কিন্তু তার সঙ্গে একটুখানি নূতন মন্ত্র যুক্ত হইয়াছে এই :—যে দেবতা ধনীর মধ্যে নির্ধনের মধ্যে সমভাবে আছেন, যিনি বিশ্বমানবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি দারুণ দুর্গতি ও পাপের মধ্যে, তাঁহাকেই বারম্বার নমস্কার করি। এ মন্ত্র পশ্চিমের, পূর্ব্বদেশকে এ মন্ত্র লইতেই হইবে—নহিলে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব—এ দুয়ের শুভ মিলন কোন দিন ঘটিবে না।

আমি যে কথাটি লিখিলাম এই কথাটিই বিশেষভাবে অনুভব করিয়া একদা রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। দেশকে ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিলে তাহাকে তাহার প্রকৃত স্থানে দেখা যায় না—ভাবুকের ভাব ক্রমাগত অভাবের দিকে অন্ধ থাকিয়া তাহার উপরে নিজের কল্পিত ভাব আরোপ করিতে থাকে। বালবিধবাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইয়া তাহার চিরজীবনের বেদনাটাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়, যাহা অন্যায় তাহাকেও এমনি পোষাক পরায় যাহাতে তাহা কল্যাণের রূপ ধারণ করে। সেই ভাবুক—সুতরাং দেশকে সে যতই ফাঁপায় ততই তাহাকে চিনিবার পক্ষে এবং তাহার সেবা করিবার পক্ষে সে অযোগ্য হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ইহাই অনুভব করিয়া এক সময়ে স্বাদেশিকতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বোধহয় ১৩১৫ সালে।

ইহার একটুখানি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস 'গোরা" উপন্যাসে কবি খোলসা করিয়া দিয়াছেন। নিজের জমিদারী-তেই গ্রাম্যসমাজের সংশোধনকার্য্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে সুদৃঢ় ঐক্য ও সহযোগিতার ভাব বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিতে আমাদের গ্রাম্যজীবনের গুরুতর দুর্গতিগুলি তাঁহার চক্ষে পড়িল। একবার হিন্দুপাড়ায় আগুন লাগাতে গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগুন নিভায় নাই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হা-হুতাশ করিতেছিল, তাহাদের চাবুকের হুকুম দেওয়া হইল; শেষে মুসলমানপাড়ার লোকেরা আগুন নিভাইয়া দিয়া গেল

এবং হিন্দু প্রজারা আক্ষেপ করিতে লাগিল যে, প্রথমেই কেন চাবুক মারা হয় নাই! এই সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে আমাদের মনুষ্যত্ব কোন্ তলায় তলাইয়া গেছে—শক্তি কি মৃতপ্রায়—সুতরাং যে ভেদবুদ্ধি ও কৃত্রিম সংস্কার এই মনুষ্যত্বকে চাপিয়া মারিয়াছে এবং মারিতেছে তাহা যে দেশকে কখনই বড় করিতে পারে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে জানাতে ভাবুকতা দিয়া মেকীকে আসল বলিয়া আর চালানো সম্ভবপর হইল না।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে এ বিদ্যালয়ে কবি বিদ্যার্থীদিগের চিত্ত যাহাতে সংস্কারমুক্ত হইয়া উঠে, যাহাতে অন্যায়কে অন্যায় বলিতে এবং আঘাত করিতে তাহারা বুদ্ধি এবং হৃদয়ের দিক্ হইতে কোন বাধা না পায় সেইরূপ শিক্ষা ও উপদেশ দিবেন। পূর্ব্বে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে অন্যরকম করিয়া ভাবিতেন, সেই জন্য দেশাচার ও লোকাচার বিদ্যালয়ের আদর্শের দিক্ হইতে বাধা পাইত না—বরং খানিকটা প্রশ্রয় পাইত। এই সময়ে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতে হইল যে এ বিদ্যালয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন যাহাতে ছাত্রগণের মন সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারে, স্বাধীন ভাবে, সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ও আলোচনা করিয়া দেখিতে পারে, সুতরাং সামাজিক আচার লঙ্ঘনের অপরাধ এ বিদ্যালয়ে দণ্ডিত হইবে না।

এ প্রশ্ন এখানে ওঠা স্বাভাবিক এবং এই ব্যাপারটি ঘটিতে তাহা উঠিয়াও ছিল যে তাহা হইলে এ আশ্রম সাম্প্রদায়িক আশ্রম হইল—ইহাতে সকল সম্প্রদায় সকল ভাবের লোক আর

তাহা হইলে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু সত্যের কি কোন সম্প্রদায় আছে? আমি যদি বলি যে পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, ইহা সত্য এবং প্রমাণ করিয়াছি তবে কি তাহা সকল দেশের সকল বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের সত্য হইবে না? আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বৈষম্য জগতে আছে এবং থাকিবেই, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ও থাকিবেই—কিন্তু যদি এমন কোন আচার অনুষ্ঠান থাকে যাহা স্পষ্টতই অন্যায়—যাহাকে যুক্তি, হৃদয়, ধর্ম্ম কোন দিক্ দিয়াই ভাল বলা যায় না—তবে তাহা যে বর্জ্জনীয় একথা বলিলেই কি সাম্প্রদায়িক হইতে হইবে? আমি যতদূর বুঝি, আশ্রম সেই স্থান যেখানে সকল দেশের, সকল সমাজের, সকল মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ সত্য জ্ঞানে চিন্তিত হইবে, হৃদয়ে অনুভূত হইবে এবং নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে পরকীর্ত্তিত হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই নিজের নিজের পার্থক্য লইয়া সেখানে মিলিয়া থাকিতে পারিবেন—কারণ সেখানে তাঁহারা সকলেই সত্যান্বেষী, সত্যের সেবক।

একটা উদাহরণ দি। রামমোহন রায়কে মুসলমানেরা মৌলবী বলিত, খৃষ্টানেরা খৃষ্টান বলিত। তাহার কারণ তিনি সকল সভ্যতার ভিতরের সত্য জিনিসটি দেখিতে পাইতেন। অথচ তিনি নিজেকে চিরকাল হিন্দুই বলিয়া গিয়াছেন, কারণ, তাঁহার ধর্ম্ম, আচার অনুষ্ঠানের বিশেষত্বটুকু হিন্দুর নিজস্ব। এই বিশেষত্বটুকু লোপ করিয়া দিবার জিনিস নহে, অথচ উদার মনুষ্যত্ব এবং সত্যদৃষ্টির ইহা অন্তরায় না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। যেমন আমি। আমি আমিই তুমি নই বা তৃতীয় ব্যক্তি নই।

আমার মধ্য দিয়াই আমার অভিব্যক্তি—সেই আমার বিশেষ রূপ। অথচ আমার অভিব্যক্তি কি কথনো এমন হইবে যাহা সকল মানুষের নিজের জিনিস হইবে না—আমি যদি কবি হই, তবে এমন কাব্য কি আমি লিখিব যাহা সকলে মিলিয়া উপভোগ করিতে পারিবে না? সেই আমার মানব রূপ। এ দুইরূপ একত্র আছে বলিয়া আমি আছি। ঠিক সেই রকম। রাম-মোহন রায়ের বিশেষরূপ তাঁহার হিন্দুরূপ অথচ তাহা তাঁহার বিরাট মানবরূপের প্রকাশের পক্ষে বাধাজনক হয় নাই। আমি সেই মহাপুরুষকেই আধুনিক সাধনার আদর্শ (type) বলিতে চাই। আমাদেরও সেই ভাবেই বুঝিতে হইবে আশ্রম সাম্প্রদায়িক কি অসাম্প্রদায়িক—ইহার সঙ্গে প্রাচীনের একটা যোগ আছে এবং ইহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় তা তো সত্য—কিন্তু ইহার মধ্যে সকল মনুষ্যেরই স্থান আছে ইহাও তেমি সত্য। ইহার মধ্যে যদি কাল একজন ইউরোপীয় বা নিগ্রো বা অন্য কোন জাতির লোক আসিতে চায়, সেও আসিবে, তবে তাহাকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতে হইবে, এইটুকু যা কথা।

সুতরাং আশ্রমের মধ্যে আমরা যেন কোন দিনই সাম্প্রদায়িক কোন কথাই না তুলি। ইহার বিশ্বরূপটিই যেন দেখি। ইউরোপে আমেরিকায় এই আদর্শে বিদ্যালয় হই-তেছে, সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে তাহার খবর পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতির সংবাস ও আনুকূল্য ছাত্রদের হৃদয়মনের বিকাশের পক্ষে পুস্তকাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়, গুরু-

শিষ্যের সম্বন্ধ দেনাপাওনার সম্বন্ধ যাহাতে না হয় তজ্জন্য তাঁহাদের একত্রাবস্থান বাঞ্ছনীয়, কোনো সামাজিক বা স্বাদেশীক সংস্কারে বালকবালিকাদিগের মন গোড়া হইতেই বাঁধা ঠিক্ নয়—এমনতর আদর্শের কথা পশ্চিমদেশীয় লোকের মুখেও শুনি—ইংলণ্ডে অ্যাবট্‌হল্‌ম্ এ জর্ম্মনীতে হার্জ্জে এমনতর বিদ্যালয় দু-একটি হইতেছে তাহাও শুনা যায়। যদি তাই হয়, তবে তাহাদিগকে আমাদেরি আশ্রম না বলিব কেন? যে আদর্শ আমরা স্বর্ব্বোচ্চ বলিয়া স্বীকার করি, সে কি আমাদেরি জনকতকের আদর্শ না সমস্ত মনুষ্যের আদর্শ? সুতরাং এ বিদ্যালয় ব্রাহ্মের না হিন্দুর সে প্রশ্নই নাই, এ বিদ্যালয় সকলের—মুসলমান খৃষ্টান যে আসে তার—প্রাচীনকালে গৌতমের আশ্রমে যদি ভর্ত্তৃহীনা বালার সন্তান সত্যকাম স্থান পাইয়া থাকেন, উপনিষদে সে কথা থাকে, তবে এমন কে আছে যে বর্ত্তমান আশ্রেমে স্থান পাইবে না?

তবে একটি জায়গায় মিল থাকা চাই—সে এই বিশ্বজনীন আদর্শ। আধুনিক যুগগুরু রামমোহন যে ভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এ আশ্রম সেই ভাবে অসাম্প্রদায়িক—কিন্তু তাঁর সম্মুখে যে সংগ্রাম ছিল, ইহার মধ্যেও তাহাই আছে। সুতরাং যে আদর্শে আপনাদের ভেদবিভেদ সমস্ত মিলাইয়া দিব, সেই সর্ব্বোচ্চ সত্যের আদর্শই এখানকার। ওঁ পিতানোঽসি আমাদের মন্ত্র, পিতা তিনি সকলের—পিতানোঽবোধি আমাদের সাধনা—সেই বোধকে এখানে আমাদের জাগাইতে হইবেই।

আমি বলিয়াছি যে স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পর

হইতেই আমরা কড়া ডিসিপ্লিনওয়ালা ও নীতিপরায়ণ হইয়া কঠোরতার চেষ্টায় মন দিয়াছিলাম। অথচ ভিতরে ভিতরে আমরা শুকাইয়া যাইতেছিলাম—আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও স্বাতন্ত্র্যপরতা কর্ম্মের যোগে দূর না হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা তখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ইহাকে দেখিতেছিলাম—কেহ দেশের দিক্ হইতে, কেহ বা চরিত্রগঠনের দিক্ হইতে। তখন ঐ বিশেষত্বের রূপই কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যে আধ্যাত্মিক আদর্শ সকল খণ্ড আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া সকল বিশেষত্বকে একমুখীন্ করিয়া দেয়, তাহাকে তো আমরা চাহি নাই।

১৩১৫ সালের শেষভাগে নানা কারণে ভূপেন বাবু কর্ম্মত্যাগ করিলেন। মোহিত বাবুর বিদায়ের পর হইতেই তিনি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সকলের দাদা ছিলেন, তাঁহার স্নেহ ও যত্ন হইতে কেহই বঞ্চিত ছিলেন না। এমন কি ভৃত্যেরাও তাঁহার স্নেহে বশীভূত ছিল। বিদ্যালয়ে ১৫৲ টাকা করিয়া পূর্ব্বে লওয়া হইত, কিন্তু তাহাতেও আর্থিক অকুলান হয় বলিয়া ১৩১৩ সাল হইতে ১৮৲ টাকা করিয়া মাসিক ও ২০৲ টাকা করিয়া প্রবেশিকা লওয়া স্থির হয়। ভূপেন বাবুর মধ্যে একটি জিনিষ ছিল যাহা এখানে আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই; সে ঐ পরসেবা—যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। রোগীর সেবা তাঁহার মত প্রাণ দিয়া করিতে কাহাকেও দেখি নাই। দরিদ্রভাণ্ডার তাঁহারি যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তিনি ও তাঁহার বন্ধু

হরিচরণ বাবু উভয়ে তাহা হইতে অর্থ বস্ত্র দ্বারা দরিদ্রদের দুঃখ নিবারণ করিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি পরিশ্রম করিতেন, একলা এই বৃহৎ বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচপত্র, কাজকর্ম্ম পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন—আমাদের আব্দার, নিন্দা, অভিমান সস্নেহ ক্ষমায় সহ্য করিতেন ও পিঠে হাত বুলাইয়া আমাদের শান্ত করিতেন। বালকেরা তাঁহার হৃদয়মাধুর্য্য অল্পই ভোগ করিয়াছে, কিন্তু অধ্যাপকেরা সকলেই তাঁহার স্নেহপরায়ণ হৃদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ১৩১৫ সালের শেষাশেষি তিনি বিদায় লইলেন। তাহার পর হইতে একটু একটু করিয়া আমাদের ধারণার মধ্যে এই কথাটি আসিতে লাগিল যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষয় করাই সাধনা—কর্ম্মকে ফলের দিক্ হইতে ধরিলে কেবলি বন্ধনের পর বন্ধন জড়ায়—নিজের মধ্যেও শান্তি থাকে না, বাহিরেও চারিদিক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমরা বুঝিলাম ম্যাথু আরনল্ড যে Two duties kept at one এর সাধনার কথা বলিয়াছেন যে দুই বিপরীত কর্ত্তব্যকে সামঞ্জস্যে মিলাইতে হইবে—toil unsevered from tranquillity কর্ম্মকে শান্তি হইতে অবিচ্যুত রাখিবার সাধনা—তাহাই আমাদের আশ্রমের মর্ম্মগত সাধনা।

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
করিয়ে দিয়েছ সোজা
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু, নামাও

ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি
এ যাত্রা মোর থামাও !

সেই সময়ে কবি আমাদিগকে লইয়া প্রত্যহ মন্দিরে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তিনিকেতনের উপদেশাবলীর মধ্যেও বোধ হয় দুই দিকের সামঞ্জস্যের কথাই বারম্বার বলা হইয়াছে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কেবল দুইটি অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য আজ শেষ করিব।

১৩১৫ সালে প্রতি ঋতুর আনন্দকে উৎসবের দ্বারা সজ্ঞান-ভাবে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ঋতুতে ঋতুতে উৎসবের আয়োজন করা হয়। বর্ষার উৎসব হইল—ইংরাজি সংস্কৃত বাংলা কাব্যসাহিত্য হইতে ছেলেরা আবৃত্তি করিল—বেদ গান করিল এবং বর্ষাসঙ্গীত করিল। তার পরে শরতে উৎসবের জন্য 'শারদোৎসব' রচিত হইল।

১৩১৬ সালে মহাপুরুষ দিগের জন্ম কিম্বা মৃত্যুদিনে তাঁহা-দিগের চরিত ও উপদেশ আলোচনার জন্য উৎসব করা স্থির হইল। খৃষ্টমাসে প্রথম খৃষ্টোৎসব হইল। তার পরে চৈতন্য ও কবীরের উৎসব হইয়াছিল। সকল মহাপুরুষকেই ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার সংকল্প হইতেই এ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি।

ইহার পর এখনকার কথা। কিন্তু তাহা এখনও এতটা দূরে যায় নাই, যে তাহার ইতিহাস বলা যাইতে পারে কিম্বা তাহার কোন ছবি আঁকিয়া তোলা যাইতে পারে। সুতরাং এই খানেই শেষ করিতে হয়। আমার ভয় আছে যে হয়ত এই প্রবন্ধেই

আমাদের তুচ্ছ ও অনিত্য কীর্ত্তির কথাই বেশী করিয়া বলা হইয়াছে—অত্যুক্তি আসিয়া পড়িয়াছে। যদিও তাহাই বাঁচাইয়া চলিতে আমি প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছি যে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। আমি জানি যে আমরা যাহা গড়িয়াছি তাহা কেবলি ভাঙ্গিয়াছে—এ বিদ্যালয় আমাদের গড়া নয়, কারণ আমাদের সাধনা নাই, সত্যের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ নাই। যাহা করি, তাহারি দ্বারা বদ্ধ হই, তাহাতে অহঙ্কারই প্রকাশ পায়, বেদনা পাই এবং বেদনা দিই। ঈশ্বর এমনি করুন যে আমরা ক্রমেই আশ্রমে প্রবেশ করি। এখনই হয়ত মনে হইতেছে যে বুঝি বা আশ্রমে আছি কিন্তু হয়ত আছি নিজের স্বার্থের অন্ধকারায়, অহঙ্কারের শতপাকবেষ্টনের মধ্যে। বিদ্যালয়ে নয়, সেই আশ্রমে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। কাজ তখন আমাদের হইবেনা, যাঁর কাজ তিনি তাহা আপনি করিবেন।

মহর্ষি যে বলিয়াছিলেন যে শান্তিনিকেতনের কাজ আপনি হইবে—তাহার অর্থ এতদ্দিনে বুঝিতেছি। আমরা কত রকম করিয়া ইহার উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছি। কেহ ভাবিয়াছি যে পুঁথি পড়াইবার সুপ্রণালী এখানে উদ্ভাবিত হইতেছে, কেহ ভাবিয়াছি যে পুরাতন কালকে ইহাতে টানিয়া আনিবার একটা উদ্যোগ চলিতেছে, কেহ বা ভাবিয়াছি যে ছাত্রদের চরিত্রগঠন করিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধনের জন্য এখানে একটা চেষ্টা হইতেছে—এইরূপে নানা দিক্ দিয়া আমরা ইহার উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছি এবং নিজ নিজ কল্পিত

উদ্দেশ্যকে দাঁড় করাইবার জন্য থাকিয়া থাকিয়া চেষ্টা করিয়াছি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তো এই টুকু চোখ ঈশ্বরের কৃপায় ফুটিল যে বুঝিলাম যে সে সকল উদ্দেশ্যকে বৃহত্তর আর এক উদ্দেশ্যের মধ্যেই বিলীন হইতে হইবে। সে যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য—আপনাকে সকলের যোগে পরিপূর্ণ করা, সার্থক করা। আপনাকে সকলের যোগে পূর্ণ করা—কর্ম্মের ভিতর দিয়া গুহাগ্রন্থিক্ষয়করা, বিশুদ্ধ হওয়া, আনন্দিত হওয়া, ঈশ্বরে সমাহিত হওয়া। বস্, ঐ একটি মাত্র উদ্দেশ্য তাহারি মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃত ব্যাপক আয়োজন আছে, দেশচর্য্যা আছে, সংসার সমাজের মঙ্গলসাধন আছে,—কি নাই বল! আকাশের মধ্যে যেমন একটি ধুলিকণাও আছে আবার অগণ্য গ্রহনক্ষত্র আছে, তেমনি এই বড় সাধনার মধ্যে ছোট হইতে বড় সব জিনিসই আছে। কিন্তু মুখ্য ইহাই—আগে ইহা, পরে সমস্ত। অনন্ত আকাশকে বাদ্ দিয়া যদি ধূলিকণাকেই দেখি, তবে তখন সে ধূলির আর কোন সৌন্দর্য্য থাকে না—কারণ অনন্তের মধ্যেই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য। তেম্নি এই সাধনার অন্তর্গত করিয়া যাহা লইব, কিছুই আর অশান্তির কারণ হইবে না—জ্ঞানানুশীলন যদি লই, তবে তখন আশ্রম আর বিদ্যালয় হইয়া পড়িবে এ ভয় থাকিবে না—যদি এমন হয় যে এখানে ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষারও সংস্থান হইবে, ক্রমে নানা বিদ্যালয়ের যোগে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ধারণ করিবে—এখানে নব নব জ্ঞানের বিকাশ দেখা দিবে—হোক্—সমস্তই ব্রহ্মসাধনার অন্তর্গত হইয়া থাকিবে—সমস্তের

স্থলে জলে জাগিবেন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। যদি এমন হয় যে এখানে পল্লী কতগুলি গঠিত হইয়া উঠে—যাহারা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে উদারভাবে সকল প্রকর সংস্কার ও নিরর্থক আচারের বন্ধন অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া এখানে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া তুলিবে, রস্কিনের সংকল্পিত Company of st. George-এর মত—তবে সেই সকল বিচিত্র মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্যেও জানিব যে শিবং যিনি, তিনিই প্রকাশ পাইবেন—সে সমাজসাধনাও তাঁহারি সাধনার অঙ্গীভূত হইবে। হোক্ কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গো-মহিষশালা, আধুনিক যন্ত্রতন্ত্রের বিপুল আয়োজন—কখনই তাহারি মধ্যে তাহাকে শেষ করিয়া দেখিতেই পারিব না—তাহাকে ছাড়াইয়া বলিব নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। আমার তো কল্পনা হয় যে এ সমস্তই এই আশ্রমে হইবে—এই আশ্রমে মানে এই ভূখণ্ডটুকুর মধ্যে নয় এবং আমাদের খণ্ডকালটুকুর মধ্যেও নয়—কারণ আশ্রমকে আমি এই কয় কাঠা জমির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখি না তাহা পূর্ব্বেইবলিয়াছি। সত্য আশ্রম আমাদের মানসলোকে সে আদর্শ আশ্রম—এখানে এখন যে টুকু দেখিতেছ সে তাহার ক্ষীণতম অস্পষ্টতম ছায়ার ছায়া। এই এতটুকু ততটুকু—সামান্য তুচ্ছ আমাদের গড়া আয়োজনের মধ্যে সেই, বিশ্বআশ্রমকে সেই একেকটি মানবজীবনের ফুলের মত ফুটাইয়া তুলিবার পুণ্যক্ষেত্র আশ্রমকে খর্ব্ব করিয়া দেখিয়োনা। এই আশ্রমে আজ আমাদের কতটুকু জ্ঞানানুশীলন প্রকাশ পাইল? কিছুই নয়। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে এখানে

দেশ বিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহৃত হইবে—যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্য লাভ করিবে! সাহিত্য চিত্র সঙ্গীত শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানেই ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সকল জ্ঞানী এদেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত—এইখানে সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে—এইখানে ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ—সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্য সকল উদ্ধার করিবেন, উদ্ভাবনীশক্তি এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্ভাবন করিবেন। সেই মানসলোকের পরিপূর্ণ জ্ঞানতপস্যার সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে আজ দেখ! জ্ঞানের দিক্ দিয়া যেমন কর্ম্মের দিক্ দিয়া তেমনি আমাদের কি সামান্য কর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে সে উল্লেখযোগ্যই নয়। আমরা যে এতগুলি ভাই এখানে মিলিয়াছি, আমাদের পরস্পরের সুখ দুঃখ কি আমাদের আপনার সুখ দুঃখ হইয়াছে, এখনও আমাদের প্রীতির ক্ষেত্র নিজ নিজ পরিবারেই আবদ্ধ আমাদের মধ্যে সেই নিবিড় অন্তরতর যোগবন্ধন তো হয় নাই যাহাতে আমরা খুব কাছাকাছি আসিতে পারি? কিন্তু সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখা আশ্রমের আদর্শ—এখানে এমন পরিবার সকল আসিবে যাহারা সহযোগী হইয়া একান্নবর্ত্তী হইয়া কাজ করিবে—যাহাদের প্রীতি ও মঙ্গলভাব সকলের প্রতি, পশুর প্রতি, পক্ষীর প্রতি, কীট পতঙ্গের প্রতি প্রসারিত হইবে—যাহারা স্বাধীন হইবে, যাহারা কোন মিথ্যার হাতে ধরা দিবে না, কোন কদাচারকে প্রশ্রয় দিবে না, যাহা সকলের

পক্ষে কল্যাণকর, যাহা নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম্ম তাহাই জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে আচরণ করিবে। যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। এমন কর্ম্মই করিবে যাহা ব্রহ্মকে অর্পণ করা যায়। তাহারা প্রীতিকে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে খণ্ডিত করিবে না ইহা নিশ্চয়। দেখ সেই ভবিষ্যৎ আনন্দোজ্জ্বল সেই সকল দীপ্ত মূর্ত্তিগুলি! এ দেশের মৃতপ্রায় সমাজকে যাহারা প্রাণ দিবে—ইহার গলার ফাস খুলিয়া ইহাকে রক্ষা করিবে। হে বন্ধুগণ, হে প্রিয়তম শিষ্যগণ, আজ সেই আশ্রমকে আমরা আনন্দে অভিবাদন করি—যাহা সেই সুদূরের মধ্যে আপনার রচনা নির্ম্মাণ করিতেছে। আজ আশায় আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হোক্—এ আশ্রমের অন্তরে বাহিরে এখনও কত সঙ্কট প্রচ্ছন্ন - কিন্তু অরুণবরণ উদার প্রভাতে সন্ধ্যাপয়োদকপিশ সেই সকল আতঙ্কের ছায়াকে ডরাইব না—নিশ্চয় জানিব যে, সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়া সেই মহা-আশ্রম একদিন জাগিবেই। এখানে যে মহাপুরুষ ঐ সপ্তপর্ণ-দ্রুমতলে তপস্যা করিয়াছিলেন তিনি এই আশ্রমের মধ্যে একটি অক্ষয় ব্রহ্মাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কেমন নিশ্চিন্ত ছিলেন,—তিনি বলিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনের জন্য তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন, সেখানে কাজ হইবেই। সেই কাজ এই একাদশ বৎসর ধরিয়া নানা বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া হয়ত আরম্ভও হয় নাই এবং কত বৎসর ধরিয়া যে সে আপনাকে এই দুর্ভাগ্য দেশে সফল করিবে সে যাঁহার কাজ তিনিই জানেন।

কিন্তু আমরা যেন তাই বলিয়া মনে করিনা যে আমরা ইহার বড় মূর্ত্তি দেখিলামনা বলিয়া আমাদের কোন নৈরাশ্যের কারণ আছে। ইহাকে যদি পরিপূর্ণ করিয়া দেখি, তবে ইহার জন্য যাহা করিব তাহা শূন্য হইবে না, তাহা আমাদের সব অভাব ভরিয়া দিবে। আমাদের আত্মোৎসর্গ হইল না, আমরা আনন্দে এখানে সব শক্তি ঢালিয়া দিতে পারিলাম না, কিন্তু হে সৌম্যগণ, তোমাদের যে দিন আসিবে, সে দিন আমাদের অপেক্ষা উৎসাহ উদ্যম বল ভরসা লইয়া তোমরা কাজ করিয়ো, তখন তোমাদের কাছে আমরা ত্যাগ শিখিব, তোমাদের নির্ম্মল জীবনে আমাদের যত দুর্ব্বলতা অপরাধ সব ধুইয়া যাইবে। আশ্রম এখনও একটি অপেক্ষা হইয়া আছে—সে তাপস চায়, ত্যাগী চায়,—এখানে যাঁহারা যেটুকু আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ও আমাদের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন। আজ সেই পূর্ব্ব আচার্য্যগণকে প্রণাম এবং ভাবী তাপসবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ ও প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া আমার এ আলোচনা শেষ করি। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

হরিঃ ওঁ

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপকগণ।

১৩০৮—৺ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব।

১৩০৯, ১৩১০, ১৩১১—

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জলাল ঘোষ, ৺ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৺ সতীশচন্দ্র রায়, বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, মিঃ লরেন্স, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভবেন্দ্রনাথ, ৺ মোহিতচন্দ্র সেন, কানাইলাল গুপ্ত, অক্ষয়কুমার বসু, তারিণীচরণ রায়।

১৩১২—১৩১৮—

মিঃ কেল্‌কার, মিঃ সানো, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়, পূর্ণচন্দ্র বাগ্‌চি, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেশচন্দ্র রায়, সত্যেশ্বর নাগ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্যারী-মোহন দত্ত, নরেন্দ্রনাথ রায়, নবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচন্দ্র রায়, হিমাংশুপ্রকাশ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺ সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, অশোক-কুমার গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ দাস, অচ্যুতকুমার সরকার, ব্রহ্মবিহারী সরকার, নকুলেশ্বর রায়, অবনীনাথ মিত্র, ৺ হিরণকুমার সিংহ, ৺ অনীলকুমার সিংহ, নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়, রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৺ শমীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, হিমাংশুনাথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেন, ৺ যোগরঞ্জন

গুহ, দেবরঞ্জন গুহ, পুণ্যব্রত, অরুণচন্দ্র সেন, অরবিন্দমোহন বসু, সুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, উপেন্দ্রচন্দ্র ভটাচার্য্য, যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমানন্দ সিংহ।

নলিনী ভৌমিক, প্রমোদকুমার রায়, প্রণবদেব মুখোপাধ্যায় প্রিয়কান্ত রায়, কামাখ্যাচরণ রায়, পশুপতি সান্ন্যাল, প্রফুল্ল দেববর্ম্মা, প্রশান্ত দেববর্ম্মা, অপূর্ব্বকুমার চন্দ, গৌরগোপাল ঘোষ, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, ৺ মতিলাল দাস, ক্ষিতীশ মুস্তোফী, যতীন্দ্রনাথ পালিত, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যভূষণ মজুমদার, জগৎমোহন চট্টোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী, নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, মাখন বসু, মতিলাল বসু, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, তুহীনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরেণু গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন বসু, ৺ রামশশী গঙ্গোপাধ্যায়, অমরকুমার বসু, সুকুমার বসু, জ্যোতির্ম্ময় হালদার, ৺ পরিতোষ হালদার, সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত, অশোককুমার সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ রায়, মন্মথনাথ মিশ্র, জ্যোতির্মোহন মিশ্র, বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত, শশাঙ্কভূষণ সেনগুপ্ত, চণ্ডীচরণ সিংহ, ভবানীকুমার রায়, সত্যেন্দু ভট্টাচার্য্য, হৃষীকেশ সিংহ, প্রণবেশ সিংহ, প্রমথেশ সিংহ, ত্রিদিবেশ সিংহ, অমরেশ সিংহ, শশাঙ্ক সিংহ, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রমোহন সেন, যোগেশচন্দ্র সেন, অমরকুমার বড়াল, গিরিজা চক্রবর্ত্তী, হিমাংশু হাজরা, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ দাস, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র খাঁ, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; মাখন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রকুমার সরকার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব

ও সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার রাহা, বলীন্দ্র মৌলিক, বিপুলকৃষ্ণ রায়, কল্যাণ ও বিজেতা চৌধুরী, মাখনচন্দ্র বসু, সুবোধচন্দ্র বসু, অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বেশ্বর বসু, বীরেন্দ্রনাথ বসু, সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, ত্রিগুনানন্দ রায়, ৺ সরোজচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুধীররঞ্জন দাস, হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়. সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হরিশ্চন্দ্র দাস, বিনোদবিহারী দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগ্চি, কালীপদ সেন, দীনেন্দ্রকুমার দত্ত, সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্র মিত্র, সুধীর মিত্র, মুরলীধর পাল, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ সেন, হরিহর ঘোষাল, হরিহর চক্রবর্ত্তী, সুবোধ সেন, রমেশ চক্রবর্ত্তী, রাধাবল্লভ কুণ্ডু, যোগেশ ভট্টাচার্য্য, শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন সেন, রমেশচন্দ্র সেন, অবনীনাথ রায়।

শান্তিনিকেতন-সঙ্গীত।

আমাদের "শান্তিনিকেতন"।
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশভরা কোলে,
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন।

মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি-কানন।

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে একতানে
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে একমন।